যশাইতলার ঘাট

যশাইতলার ঘাট

বেদুহন

বিদ্যোদয়

লাইব্রেরী

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড
৭২, হ্যারিসন রোড (মহাত্মা গান্ধী রোড)
কলিকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ : ১৩৬৪
এপ্রিল : ১৯৫৭

প্রচ্ছদ-শিল্পী
শ্রীনীলরতন চট্টোপাধ্যায়

দাম : দুই টাকা আট আনা

প্রকাশক : শ্রীমনোমোহন মুখোপাধ্যায়, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, ৭২ হারিসন রোড, কলিকাতা ৯। মুদ্রাকর : শ্রীঅমৃতলাল কুণ্ডু, জ্ঞানোদয় প্রেস, ১২ মহারানী স্বর্ণময়ী রোড, কলিকাতা ৯

এক

এগারশ' উনপঞ্চাশ সাল।

মারাঠার আক্রমণে বাংলার নবাব-নাজিম আলিবর্দি খাঁ উদ্ব্যস্ত, আর বাংলার নরনারী সন্ত্রস্ত।

সেদিনের আবছা ইতিহাসের ছেঁড়া পাতায় এই কাহিনীর যশাই-গাছের সামান্য উল্লেখ রয়েছে। সেই যশাইয়ের ঘাটেই এই কাহিনীর উৎপত্তি।

তারপর দুশো বছর পেরিয়ে গেছে। বাংলার বুকের ওপর দিয়ে সহস্র সহস্র পরিবর্তন চলে গেছে, যশাই যেমন ছিল তেমনই আছে। এর অতি পুরাতন ইতিহাস যে কি তা সঠিক করে কেউ বলতে পারে না, বংশ-পরম্পরায় শোনা কথা উপকথার মত ছড়িয়ে রয়েছে আশে-পাশের দশবিশখানা গাঁয়ে। বোধ হয় পদ্মার ভাটিতেও নেমে গেছে যশাইয়ের গরিমা—বাংলার শেষপ্রান্ত অবধি।

এই ঘাটের ঘাটোয়াল শওকত বেপারি। পদ্মার ছোট সোঁতায় পারাপারের ইজারাদারি তার।

নৌকা লাগল যশাইতলার ঘাটে।

সাঁঝের আবছা আঁধারে যশাইতলার জামের ঝোপে বোশেখির কালো মেঘের মত ঘুরঘুট্টি আঁধার জমেছে। কাশবনের মাঝখানটায় মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে কালো জামের কয়েক গণ্ডা গাছ; কেউ কোন দিন যত্ন করে চাষ করেনি, আপনা থেকেই গজিয়েছে অজানা দিনে। মহাকালের সাক্ষ্যস্বরূপ দাঁড়িয়ে রয়েছে নিঃশব্দে। সোঁতার

পেছনে ঝোপ-বাদাড়ের ওপাশটায় গ্রামের সবচেয়ে উঁচু শিমুলগাছটাও ঝাপসা হয়ে গেছে। আঁধারি রাত না হলে তার ছায়া এসে পড়ে সোঁতার দক্ষিণ কোনায় সজাগ প্রহরীর মত।

নৌকা থেকে কাম্মু লাফিয়ে পড়ল কিনারায়।

শওকত ছইয়ের ভেতর থেকে মুখ উচিয়ে হেঁকে উঠল, "গড় করিস কাম্মু।"

এর মধ্যে কাম্মু মিলিয়ে গেছে যশাইতলার ঝোপের ওপারে, শুধু ক্ষীণ জবাব শোনা গেল, "হ।"

কাম্মুর জবাবটা ঠিকমত শওকতের কানে পৌঁছাল কিনা বোঝা গেল না। সে শুধু নিজের মনে বিড়-বিড় করে কি যেন বলতে থাকে। তার বড় ভয় এইসব এলেমদার-বুঝনদার ছেলেদের নিয়ে। ওরা পীর-দরগা, দেব-দেবতা কিছুই মানতে চায় না। শওকত তো তা পারে না। সে নিজের চোখে দেখেছে লতিফ মিঞার বেহাল। লতিফও মক্তব-মাদ্রাছায় পড়ে এলেমদার হয়েছিল, ভেবেছিল দুনিয়াটা বুঝি তার ধলাট গাঁয়ের চৌহদ্দি। চাষার ছাওয়াল, এলেমদারি করে কোথায় হবি হাফিজ-ক্বারি, তা নয়, হতে গেল মুচ্ছুদ্দি ; একেই বলে বদ নসীব।

খাগের কলম কানে গুঁজে শহরের বটতলায় মুহুরিগিরি করত, তার সাথে আসত নগদানগদ কড়ি। হঠাৎ গাঁয়ে এসে ফতোয়া দিল— যশাই হিঁদুর ঠাকরেন, মুসলমানদের সিন্নি চড়ানো গুণাহ্।

চ্যাংড়া ছোঁড়ার দল নেচে উঠল তার কথায়। নানা গাঁয়ের মুরুব্বি ডেকে ওয়াজ করল নিজের স্বপক্ষে ; কেউ বুঝল, কেউ বুঝল না, কিন্তু যশাইয়ের সিন্নি বন্ধ হল না। কেউ সাক্ষাতে, কেউ অসাক্ষাতে পাল-পরবে সিন্নি দিতে ত্রুটি করত না। লতিফ মনে মনে গর্জায়, ছোঁড়ার দল তড়পায়, তবুও যশাইয়ের সিন্নি বন্ধ হয় না।

সেদিন সকালে নইম চৌকিদারের বিবির সাথে মুখোমুখি দেখা। চৌকিদারের বিবি চলেছে নাতির আখিকায় সিন্নি চড়াতে। পড়বি তো পড় একেবারে লতিফের সামনে। যুক্তিতর্কের ধারও ধারে না

চৌকিদারের বিবি, লতিফও ছাড়বার বান্দা নয়। যুক্তির চেয়ে শক্তি বড়। লতিফ জুতোর তলায় সিন্নির মালশা গুঁড়িয়ে দেয়।

নইমের বিবি ফিরল কাঁদতে কাঁদতে, সেই রাতে লতিফ ফিরল ভেদবমি নিয়ে। রাত না পোয়াতে লতিফের জানমালের পর্ব শেষ। সবাই বুঝল যশাইয়ের দয়া। যশাই কারুর খাসমহলের প্রজা নয়, সবার দেবতা, এমন কি পিরজিপাড়ার কেরেস্তান সাঁওতালদেরও। শওকত নিজের চোখে লতিফের বেহাল দেখেছে, এর পরও যখন শোনে, ফলানা গাঁয়ের ফলানা লোক যশাইয়ের সিন্নি চড়ায়নি, তার বুক আপনা থেকেই কোন অমঙ্গলের আশঙ্কায় কেঁপে ওঠে—ভক্তিতে নয়, ভয়ে।

কাম্মুর চলে-যাওয়া পথ পানে চেয়ে থাকতে থাকতে শওকত ক্লান্ত হয়ে ওঠে। হুঁকোর মাথা থেকে কল্কেটা নাবিয়ে শুলকাতে থাকে।

কিছুকাল থেকেই সে ভাবছে দশজনার বুদ্ধিতে কাম্মুকে মক্তব-মাদ্রাছায় না পাঠালেই ভাল হত। লতিফের মত কানে খাগের কলম গুঁজে মাঝে মাঝেই আজকাল সে ছয়পোয়া পথ হেঁটে শহরে যাচ্ছে। কাঠের নৌকার বৈঠা তাকে আটকে রাখতে পারেনি, ভিন্ নৌকার হাল ধরতে সে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। কদিন আগে একরার দিয়ে আদালতে নাম বদলে এসেছে। কিন্তু বদল করবার আগে বাপের মতটা নেবারও দরকার মনে করেনি।

শহর-ফেরতা একদিন সে বলল, "নাম বদলে এলাম বা'জান।"

শওকত ঠিক বুঝতে পারল না, অবাক হয়ে চেয়ে থাকে কাম্মুর মুখের পানে। বিশ বছরের মদ্দজোয়ান ছেলে, কোথায় ডিঙির মাথায় সিনা উঁচিয়ে বসবে, হালের টানে গাঙের জল ছলছলিয়ে উঠবে, তা নয় সে কি-না নাম বদলে এল। ঐটে যেন সব চেয়ে বড় কাজ যা না করলে তার বাপ-দাদার রোজকিয়ামতে জবাবদিহি করবার কেউ থাকত না। কিসের নাম, কার নাম, আর বদলই বা কিসের। অনেক প্রশ্ন করে বসল তাকে।

নির্বিকারভাবে কাম্মু জবাব দিল, "আমার নাম। আজ থেকে আমার নাম হল কমরুদ্দিন। এখন লোকে বলবে শওকত বেপারির বেটা আসল মোছলমান। কি নাম! কাম্মু! হ, তুনিয়ায় আল্লাতাল্লা আর নাম দেয়নি তোমায়!"

শওকত গর্জে উঠল, "তোর বাপের দেয়া নাম, সেইটে হল বেয়া। পাল্টে এলি, জিজ্ঞেসও করলি না!"

বাপের মেজাজ সে ভালই জানে, সে ভয়ে চুপসে গেল। রাগ না চণ্ডাল! কখন যে বৈঠা তুলে ঘা কতক বসিয়ে দেবে তারই বা ঠিক কি! বেমক্কা কথা বলার শাস্তি পাবার ভয়ে সুমুখ থেকে হটে দাঁড়িয়ে কাম্মু যেন বেঁচে গেল।

শওকত ভাবতে পারে না এত বড় অন্যায়টা তার ছেলে হয়ে কাম্মু করল কি করে। নাম তো নাম, নাম বদলালে তো মানুষ বদলায় না। কাম্মু আজ কমরুদ্দিন হলেও শওকত তার বাপ, এরফান তার দাদা এসব কি বদলে যাবে নাম বদলের সাথে! তা যখন নয়, তখন বাপের মুখে কালি না দিলেই কি চলত না!

শওকত সাবধান হল সেদিন থেকে। ঘাটের ইজারাদারি থেকে ঘরের বদনা পর্যন্ত কাম্মুর মায়ের নামে দানপত্র করে দিল। কাম্মুর মতি ভাল নয়, কবে কি করে বসবে তার ঠিক নেই, হয়তো মায়ের কপালে মোটা ভাতও জুটবে না।

নাম তো সামান্য। এই নামের পেছনে রয়েছে কত বড় মিতালির ইতিহাস, তা জানে শুধু শওকত একা। মিতালির সুতো বেঁধে দিয়ে শওকত ভেবেছিল সরকার-বাড়ির সাথে তার পাঁচপুরুষের ওঠাবসা আরও ঘনিষ্ঠ আর মোলায়েম হবে। মনের সুতোয় যা বাঁধা যায়নি, তুলোর সুতোয় তা বাঁধা যায় না। বিশ্বাস না করলেও শেষ অবধি তুলোর সুতো ছিঁড়ে গেছে। তবু সে আশা করেছে হয়তো কোনদিন ছেঁড়া সুতোয় গেরো দেওয়া যাবে, তা হলে তার প্রথম জীবনের অত বড় দরদ ব্যর্থ হবে না।

সরকার-বাড়ির জলে-ভাতে পাঁচপুরুষ ধরে শওকতের গোষ্ঠী বেঁচে রয়েছে। প্রথম বয়সে কোঁচড়ে মুড়ি বেঁধে ওরা করে রাখালি, বয়স বাড়লে করে মুনীষি, তার পর গা-গতরে জোর হলে নিজের ধান্দা খোঁজে। এমনি ধারা চলে আসছে কয়েক পুরুষ, আজও তার কোন ব্যতিক্রম হয়নি।

ভাদ্রের অশ্রান্ত বর্ষণে সোঁতার বাঁধ ভেঙেছে, শওকত গেছে জমির আল বাঁধতে। সরকার-বাড়ির ছোট তরফের মাঝান কর্তা যোগেন্দির আর সে দুজনে ঝপাঝপ কোদাল মারছে আলের ডগায়। জলে-কাদায় সারা দেহ মাখা, চেনবার উপায়ও নেই। এমন সময় নতুন রাখাল জসিম এসে খবর দিল, শওকত আর যোগেন্দির, দুজনের স্ত্রীই প্রসব করেছে দুটো পুত্র সন্তান। দুজনের মুখেই ফুটে উঠলো পরিতৃপ্তির হাসি। কে যে প্রথম সম্ভাষণ করবে তা ভেবে পাচ্ছিল না।

হঠাৎ যোগেন্দির হাতের কোদাল ঝপাস্ করে ফেলে দিয়ে শওকতকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, "শওকত, তুই আজ থেকে আমার মিতে।"

শওকতের এলেম না থাকলেও মুখ্যুতো সে নয়, সেও আবেগের সাথে বলে উঠল, "তার সাথে আমাদের ছেলে দুজনাও হল মিতে।"

মিতালির এমন আলিঙ্গনের মত পরিতৃপ্তি শওকত কোনদিন অনুভব করেনি, সেও এলিয়ে রইল যোগেন্দিরের বুকে।

সোঁতার কিনারায় যশাইকে সাক্ষী রেখে সেই জন্মদিনে তাদের নাম রাখলো। যোগেন্দিরের ছেলে হল কানু, আর শওকতের ছেলে হল কাম্মু। জাতের ফারাকে নামের ফারাকও রইল সামান্য। মিতালির সুতো বেঁধে দিল তাদের হাতে।

চোখ কচলাতে কচলাতে বছর কাটতে থাকে, দেখতে দেখতে পাঠশালা ছেড়ে কানু গেল শহরের ইস্কুলে, আর মক্তব ছেড়ে কাম্মু গেল মাদ্রাছায়। মিতার ছেলের সাথে তাল রেখে শওকতও

চেষ্টা করত কাম্মুকে বড় করতে, অবশ্য গাঁয়ের দশজনার সলা নিয়েই সে একাজ করেছিল।

কানু ছুটে আসত শহর থেকে। প্রথম প্রথম ছুটির দিন গুণতো কাম্মু, সরকার-বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নিত কবে আসবে তার মিতা। মাঝে মাঝে অনুযোগও করত। শনিবারে শনিবারে মিতা ইচ্ছে করলেই তো বাড়ি আসতে পারে, তা কেন সে করে না। মাসখানেক কানু না এলে অদর্শনের ব্যথায় কাম্মু কেমন বেমনা হয়ে যেত।

কানু এলেই তার শুকনো মুখে হাসির ঝলক ভেসে উঠত। দুই মিতা সেই যে বেরুত, তাদের খুঁজে পাওয়াই তখন ভার। কোথায় আমতলা, কোথায় জামতলা, কোথায় সোঁতার ঘাট আর কোথায় ঝোপদীঘি, সকাল-সন্ধ্যায় দুই মিতা ঘুরে বেড়াচ্ছে ; কত কথা, কত আলোচনা। সঙ্গী আর কেউ নয়। এমনিই বোধ হয় দিন কাটত তাদের। কিন্তু সব কিছুরই পরিবর্তন হয়, কাম্মু-কানুর কচি মনেও পরিবর্তন এল, প্রকৃতির অমোঘ কানুন তারাও মেনে নিল।

পরিবর্তন ঘটল লতিফের মত কঁজন মুরুব্বির পাল্লায় পড়ে। কাম্মু আগে বন্দরে বন্দরে মাল পৌঁছাত, হাটের কড়ি, পারের কড়ি গুণে নিত, পদ্মার উজান-ভাটিতে ডিঙির মাথায় সাদা বাদাম তুলে ভেসে বেড়াতে তার বড়ই আনন্দ লাগত। বসে বসে ভাবত, ভূগোলে পড়া সাত সমুদ্দুর তের নদী পার হতে যদি পারত তা হলে ডিঙির মাঝি খুশী হত, খুশী হত তার জিজ্ঞাসু প্রাণটা। এখন এসব আর তার ভাল লাগে না। বৈঠাতে হাত দিতে সে চায় না, কানু এলে পালিয়ে চলে। বছরও হয়নি, সেদিনও কাম্মু-কানু যুক্তি করে ঠিক করেছিল, গল্পে-পড়া মার্কো পোলোর মত দুই বন্ধুতে ডিঙি ভাসিয়ে অজানার সন্ধানে বেরিয়ে পড়বে। সেই কাম্মু বদলে গেছে, কোথায় যে আজকাল যায় খুঁজেও পাওয়া যায় না। শওকত যে না লক্ষ্য করেছে এমন নয়। শওকত বুঝতে পারে না কেন এই বিচ্ছেদ। কানু তাকে খুঁজে বেড়ায়, নিরাশ হয়ে ফিরে আসে, শওকতের বুক ফেটে যায়। মিতালির সুতো অজ্ঞাত রহস্যের ধাক্কায় ছিঁড়ে গেছে, সে

সুতো জুড়ে দেবার চেষ্টা বোধ হয় সফল আর হবে না। মিতালির শেষ চিহ্নটুকুও ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে জোর করে বাপের দেওয়া নাম বদলে। তবুও শওকত বুঝি আশা করে, একদিন তাদের ভুল বোঝা-বুঝির শেষ হবে, ফিরে আসবে তাদের পুরানো জীবনের সৌন্দর্য। আবার তাদের ছিন্ন সূত্রে গ্রন্থি পড়বে, যোগেন্দিরের মত কাম্মু-কানুও পরস্পরের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

দিন যায়, আশা যায় না।

অর্ধ সুপ্ত মনের কোনায় আশার ক্ষীণ দীপটি কখন যে ঝাপটা বাতাসে নিভে গেছে, জাগ্রত মন নিয়ে সে নিজেও তা অনুভব করতে পারেনি। তিক্ত ফলের মত বিদ্যাবুদ্ধি এলেমদারির ওপর শওকতের ঘেন্না ধরে গেল। হয়তো সে মুখ দেখাতেই পারত না, তাকে বাঁচাল যোগেন্দির। যোগেন্দির কাজ পেয়ে ছেলেমেয়ে নিয়ে চলে গেল কোন আসাম মুল্লুকে। যদি সে না যেত তা হলে সালিয়ানা যশাইতলার মেলার কথা তার বুকে রক্তের আঁচড় কেটে বসতো।

•

বছর বছর মেলা বসে যশাইতলায়। মেলার দিনটায় কাম্মুকে ডিঙিতে বসিয়ে শওকত নতুন ধান্দায় বসে। তার লাখ কাজ থাকলেও লোকসানের খতিয়ান মাথায় নিয়েও সে দোকান সাজায়। শাঁখা-সিঁদুর-নোয়া বেচতে বসে মেলার রাস্তায়। যশাইয়ের নোয়া-সিঁদুর জোগান দিলে ছোয়াব হবে, এ বিশ্বাস তার জন্ম অবধি। এত অল্প পরিশ্রমে নেক পাওয়া সহজ কথা নয়, এ সুযোগ শওকত হেলায় কখনও হারাতে চায় না।

সেবারও অভ্যেস মত দোকান সাজিয়েছে। খদ্দেরকে সস্তায় পুণ্যলাভের হিসাব দিয়ে বেচতে বসেছে শাঁখা-নোয়া-সিঁদুর।

পেছন থেকে কানু এসে জিজ্ঞেস করল, "শও-চাচা, আজ তোমার 'লাও' বন্ধ ?"

শওকত মুখ না তুলেই বলল, "না বাবা, কাম্মু আছে পারঘাটায়।"

"আচ্ছা," বলেই কানু পথ ধরল, এগিয়ে চলল সোঁতার ঘাটে।

সামনের খরিদ্দার সরে যেতেই শওকতের মনে পড়ে গেল কান্নুর কথা। মুখ উঁচিয়ে ভীড়ের মাঝ দিয়ে তাকে দেখবার চেষ্টা করে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল।

বারোহাটের নফর মাঝি। বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে সিন্নি মানত দিতে এসেছে। মেয়ের ঘরে তিন তিনটে ছেলে বছর না ঘুরতেই পেঁচোর দয়া পেয়েছে। অনেক সিন্নি মানত করে নাক ফুঁড়িয়ে এবার কোলের কুচোটা ষষ্ঠীর কৃপায় দেড় বছর পেরিয়েছে, তারই মানত। চালন-ডালায় কলা আর মণ্ডা সাজিয়ে নিয়ে এসেছে আড়াই পোয়া রাস্তা বেয়ে। এবার সতী যশাইয়ের নোয়া-সিঁদুর-শাঁখা নিলেই শেষ।

নফর-গিন্নী জিজ্ঞেস করল, "কি গো পাটনির পো, নোয়ার কি দর?"

"পয়সা জোড়া, সিঁদুর নিলে আলাদা পয়সা।"

বুড়ী মাথার ঘোমটা টেনে দিয়ে অবাক হয়ে বলল, "একটা ডবল দিতে হবে। বল কি গো! তোমাদের তরে কি মা-যশাইয়ের পুজো-সিন্নি বন্ধ হয়ে যাবে!"

শওকতের মুখে কেমন যেন আপ্যায়নের হাসি ফুটে উঠল, বলল, "পয়সা বেশী নিচ্ছি মনে করলে বিনি পয়সাতেই দেব মাঝির-বিটি। মা তো শুধু তোমার নয়, মা যে সবার।"

নফর-গিন্নী জবাব খুঁজে না পেয়ে আঁচল থেকে ছুটো পয়সা বের করে সওদাগুলো ডালায় সাজিয়ে নিল।

শওকত যেমন মাথা নীচু করে ছিল তেমনি রইল।

কখন যে কান্নু ফিরে এসে তার সামনে দাঁড়িয়েছে সে তা লক্ষ্যও করেনি। 'শও-চাচা' ডাক শুনেই সে চমকে উঠল। অশ্রান্ত বর্ষার কতকগুলো ঝাপসা মেঘ যেন কান্নুর মুখের ওপর ছায়াপাত করেছে। ব্যর্থ মিতালির শ্মশানে যেন কান্নুর বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস হাঁপিয়ে বেড়াচ্ছে, সেই গুমোটে শওকত মাথা উঁচু করতে পারছিল না।

"আমরা এদেশ থেকে চলে যাচ্ছি চাচা। বাবা আসাম যাচ্ছে কিনা, তাই আমরাও যাচ্ছি।"

শওকত জবাব না দিয়ে হাতের কাছে যা ছিল সব গুটিয়ে উঠে পড়ল। কয়েকগণ্ডা বছরের অভ্যাস থেকে সে আপনাআপনি মুক্তি পেতে চাইল তার ছোট মনোহারী দোকানের পাট উঠিয়ে।

কানু এমনটা আশা করেনি, সেও পথ ধরল।

সেইদিন থেকে শওকত কেমন বদলে গেল।

পারঘাটায় এসেই কেমন উতলা হয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে তিন বন্দরে মালটানার ঠিকা পেলে বাদাম-গুণের দড়ি হাতে নিয়ে নৌকায় চুপটি করে বসে। কাম্মুকে আর ঘাটে বসতে বলে না, মুনীষ বসিয়ে সে ডিঙি নিয়ে বের হয়। ডিঙির গলুইতে বসে মাঝে মাঝেই সে ভাবে পুরানো দিনের কথা। কেমন করে সরকার-বাড়ির সাথে তার সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে ক'পুরুষ ধরে, কেমন করে বেড়ে উঠল সরকার-বাড়ির চোখ ধাঁধানো ঐশ্বর্য, কোথা থেকে এল সব পুবা-চাষীর দল যমুনার ভাঙন থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে। সবই তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। দা-কাটা কড়া তামাকের ধোঁয়ার সাথে তার মনটা মিলিয়ে যায়, ভেসে যায় কোন অতীতে।

তারপর কত বছর কেটে গেছে।

কাম্মুকে কেন্দ্র করেই শওকতের যত ভাবনা। যশাইতলার ঝোপ পেরিয়ে কাম্মু মিশিয়ে গেছে বেনা ঝোপের ওপারে। আঁধারে দেখা যাচ্ছে না তাকে। যশাইয়ের অসম্মান শুনলে শঙ্কায় দুর্ দুর্ করে ওঠে শওকতের প্রাণ।

যশাইয়ের বয়স হয়েছে ক'শ বছর তার চিহ্ন কালের বুকে আঁচড় রেখে যায়নি একটুও। যশাইয়ের ঝোপে সাঁঐলের ডাকাত জমিদাররা কালীপুজো করেছে দু'শ বছর আগে। আরও কত কাহিনী রয়েছে এর গা জড়িয়ে। কত জামগাছ ভেঙেছে বোশেখি ঝড়ে তারও কোন

হিসাব নেই, আবার গজিয়ে উঠেছে সেই গাছের গুঁড়ি থেকে, তবুও সমানে ফুল বেলপাতা সিন্নি শাঁখা জুগিয়ে চলেছে বিশটা গাঁয়ের লোক যশাইয়ের পায়ের গোড়ায়, যশাইয়ের যশ ছড়িয়ে পড়েছে বাহির গাঁয়ে, বিশ গাঁয়ের চৌহদ্দি পেরিয়ে পদ্মার উজানে-ভাটিতে।

একি আজকের কথা। হাসমত চৌধুরী তখন ফৌজদারের পেশকার। খোটান থেকে তার বাপ-দাদা এসেছিল ফৌজদারের নকিবী করতে। কাম-কামাইয়ে জমি-জিরেত হল, আর বাড়ল ইজ্জত। তিনপুরুষ পর লাভ হল পেশকারি। মৌলবী পড়াতে বসে হাসমতের নিরেট মাথায় গুলিস্তান আর বোস্তানের পেরেক বসাতে না পেরে, তার বাপকে ডেকে বলল, "বড়েমিঞা, আপকা আদমিকা খেলাপ ঔয়ে মোচি হ্যায়।" সেই থেকে হাসমতকে 'মুচি মিঞা' বলেই সবাই জানে। সেই হাসমতই হল ফৌজদারের পেশকার আর তার সাথেই যশাইয়ের আসল-নকল সব কাহিনী জড়িয়ে আছে।

পদ্মার ভাটিতে আসছেন নায়েব-নবাব। চর চলনে তাঁবু পড়েছে।

আরবী খচ্চরে কদম উঠিয়ে হাসমত গিয়েছিল সেলাম-নজরানা দিতে। ফেরবার পথে শেরওয়ানীর জেবে নতুন জমিদারির সনদ নিয়ে খুশী মনে আসছিল, সোঁতার বাঁকে বেলা গড়িয়ে এল। পড়ন্ত বেলায় আছরের নমাজ পড়তে বসল সোঁতার কিনারায়।

সোঁতার ঘাটে তখন রূপের হাট বসেছে। কলসী কাঁখে গাঁয়ের মেয়েরা এসেছে জলকে, হাসি-কাশি, ফিসফিসানি, সোরগোল সব মিলিয়ে বিকেলের সোনালী বেলায় রূপালি ঢেউ উঠেছে। ঘাটে পুরুষ আসা মানা, তাই নিরাপদে আর নির্লজ্জভাবেও মেয়েরা কথা কইতে পারে।

চৌধুরী-বাড়ির বুড়ো ঠাকরেন, ঘোষ-বাড়ির নবৌঠান, তলাপাত্তরদের ছোটবৌ, মাঝিদের মুংলিমাসি, নেয়ামতের তৃতীয়পক্ষ আরও কত কে! হাসমত চৌধুরীর নজর পড়ল ঘোমটাটানা

তলাপাত্তরদের ছোট বউ যশোমতীর ওপর। যশোমতীর রাঙামুখে তখন আগুনের আলপনা। বিকেলের সোনালী রোদ, প্রাণ মাতানো ফুরফুরে বাতাস নবীনাদের আরও বেশী উত্তপ্ত করেছে। হাসমতের নজর পড়ল এই নিষ্পাপ কুঁড়ির ওপর। হাসমত চমকে উঠল।

তারপর কি হল কেউ জানে না। যারা জানত তারাও ফৌজদারের ভয়ে 'রা' কাড়ল না। পরদিন সকালে হাসমত চৌধুরীর লাশ পাওয়া গেল সোঁতার কিনারায় আর যশোমতীর লাশ পাওয়া গেল পাটুলির ঘাটে।

কেউ বলল ডাকাতে মেরেছে, কেউ বলল গাঁয়ের লোকে শোধ নিয়েছে, কেউ বলল বর্গী এসেছে। আসল কথা চাপা পড়ে গেল, আজও কেউ জানতে পারেনি, পারবেও না। ছুটে এল চৌধুরীর বেগম, স্বপ্নে পেয়েছে যশাইমায়ের আদেশ। সবার সন্দেহ ঘুচল; সেদিন থেকে সবাই জানল সতীমায়ের তেজে হাসমত চৌধুরী পুড়ে মরেছে।

প্রথম সিন্নি এল চৌধুরী-বাড়ি থেকে, নিয়ে এল হাসমত চৌধুরীর খাস বিবি নূরীবেগম।

বাগদাদের গোলাপ বাগিচায় নূরীবেগমের জন্ম। বাপ এসেছিল নবাব সরকারে খান-সামান হয়ে। খাজাঞ্চিখানায় মালগুজারি দিতে গিয়ে নূরীর বাপের সাথে হাসমতের পরিচয় হল। খোটানি রক্ত, টকটকে রং, ঝকঝকে চেহারা, অল্প বয়সে পালোয়ানী দেহ। বয়স অল্প হলেইবা কি হবে, পাঁচ ওক্ত নমাজ পড়ে হাসমত। খান-সামান খুশীতে ভেঙে পড়ল, বকশিশ করল নিজের মেয়ে নূরীর সাথে বে দিয়ে। সেই নূরীবেগম এল যশাইতলায় প্রথম সিন্নি চড়াতে। সেই থেকে সবাই জানল যশাইতলার নাম।

ঘেন্না নিয়ে মরেছে যশোমতী, নিন্দে নিয়ে মরেছে হাসমত। দুজনের নামের সাথে শুধু বেঁচে রয়েছে রাজা-নবাবের কেচ্ছা। রসান দিয়ে এই কাহিনী চলে আসছে দুশ'বছর ধরে।

যেখানে ছিল কালো কচুর ঝোপ, দেখতে দেখতে সেখানে বেড়ে উঠেছে আকাশ ছোঁয়া কালো জামের ঝোপ, নিন্দে আর ঘেন্নাকে আবরণ দিয়ে তারা দাঁড়িয়ে রয়েছে শ'বছর ধরে।

আরও কত কাহিনী জড়িয়ে রয়েছে যশাইতলার ঘাটকে কেন্দ্র করে, সে সব কথা বলতে গেলে পাঁচটা মানিকপীরের পুঁথি তৈরী হত অনেক আগেই। নানা কেচ্ছা শুনতে শুনতে শওকত বড় হয়েছে, ওসব গা-সহা হয়ে গেছে।

শওকত কল্কেতে আবার আগুন-চড়ায়। ডিঙির গলুই থেকে সরে এসে পাটাতনের তলা থেকে সকালের ভাত-তরকারির হাঁড়ি টেনে বের করে। সেই বিহানে কাম্মুকে সাথে করে রামেশ্বরপুরের হাটে গিয়েছিল শানদারদের মাল নিয়ে। সারাদিন বৈঠা টানতে টানতে হাঁড়ির ভাত মুখে দেবার সময় পায়নি। শানদারদের সাথেই নাস্তাপানি করে সকালের ঝামেলা মিটিয়েছে।

নাববার আগে কাম্মু বলেছিল, "বাড়ি থেকে গরম ভাত নিয়ে আসব।"

সে মানা করেছে। ভাত আনতে অনেক রাত হয়ে যাবে।

কাম্মু নেমে যেতেই সে আরাম করে পা ছড়িয়ে বসে হুঁকোয় সুখ-টান দিতে লাগল। গাঙের জলের মত নিস্তব্ধ নিস্তরঙ্গ তারও মন। বোধ হয় তার পড়ন্ত জীবনের শেষ অধ্যায়ের একখানা পৃষ্ঠা ফেরেস্তার হাতে সবার অলক্ষ্যে উল্টে গেল।

শওকত ভাত খেয়ে পাটাতনের ওপর দেহ এলিয়ে দিল।

দুই

মাঝ রাতের নিশুতি নেমে আসতেই শওকত ডিঙির রশি শক্ত করে খুঁটোয় বেঁধে ছইয়ের তলায় ভাল করে গা এলিয়ে দিল। আধো ঘুমের ঘোরে শুনতে পেল সোঁতার জলে খল-খল শব্দ। শুয়ে শুয়েই হাঁকলো, "খোলসানে মাছ আছে মিঞা, তাড়িও না।"

শওকতের গলার আওয়াজ রাতের নিস্তব্ধতাকে ব্যঙ্গ করে ফিরে এল, সেই সাথে ভেসে এল চেনা গলার প্রশ্ন, "শওকত জেগে আছিস?" অতি পরিচিত গলার শব্দে শওকতের ঘুমের ঘোর কেটে গেল।

"হ-কাকা," বলেই শওকত ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। সরকার-বাড়ির বড় কর্তা ফিরছে শহর থেকে। আজ শনিবার, শওকত ভুলেই গিয়েছে। শনিবার মাঝরাতে হপ্তার কাজ শেষ করে বিশ্রাম নিতে ফিরে আসে বড় কর্তা। ঝড়-বৃষ্টি, রাত-বিরেত কিছুই সে মানে না। শহুরে কায়দায় রস খাওয়াটা অভ্যেস হয়ে গেছে। রূপো বাঁধানো বাঁশের ছড়ি হাতে নিয়ে রসের নেশায় বুঁদ হয়ে রেসের ঘোড়ার মত ছুটতে ছুটতে এসে দম নেয় যশাইয়ের ঘাটে। নয়নজুলির বাঁধে ফি-বছরে একটা-না-একটা খুন হয়-ই হয়। সেই নয়নজুলি পেরিয়ে আসতে হয় তাকে। তাতেও ভ্রূক্ষেপ নাই। জিজ্ঞেস করলে জবাব না দিয়ে হাসে। তবুও অনেক রাতে সে আসবেই আসবে। রাত-বিরেত, মাঝ-রাত, শেষ-রাত সব সমান তার কাছে। সোঁতার ঘাটে পা ধুয়ে কম-সে-কম একটা পয়সা যশাইতলায় না দিয়ে আর আড়াই গণ্ডা সেলাম না ঠুকে এক কদমও এগোয় না।

আজ শনিবার, বড় কর্তা যখন এসেছে তখন রাতও নিদেন পেরিয়ে এসেছে। ছায়ার মত ডিঙির সামনে দাঁড়িয়ে বড় কর্তা জিজ্ঞেস করল, "মাছ আছে রে?"

"আছে কাকা, তবে রুচবে না।"

বড় কর্তা হো-হো-করে হেসে বলল, "গন্ধ পাবতো, তাতেই হবে। খিড়কির ঘাটে পোনা ছেড়েছি, মাছের বড় অভাব। তা বলে তপস্বী হতে পারব না বাপু। দে দেখি কয়েক হালি।"

আন্দাজ মত বড় বড় কটা নছি-মাছ নৌকার খোল থেকে টেনে তুলে শওকত জিজ্ঞেস করল, "কিসে নেবেন?"

পকেট থেকে রুমাল বের করে দিল বড় কর্তা। সিল্কের রুমাল থেকে মিঠে খোশবায় এসে লাগল শওকতের নাকে। একটু আমতা আমতা করে বললে, "দামী উমালটা নষ্ট হবে কাকা।"

"হোক। ওতেই বেঁধে দে।"

মাছ বাঁধতে বাঁধতে শওকত বলল, "ন্যাজা ভেঙে নাও কাকা।"

"কেন রে? ওনাদের উৎপাত হয়েছে বুঝি?"

"যশাইতলায় কারুর ট্যাঁ-ফুঁ করবার ক্ষমতা আছে! মায়ের চরণ-দেওয়া জমিন, যে জমিনে সেলাম জানালে দোজখের ভয় থাকে না, সেখানে আসবে ওনারা, হঃ। তবে এ জমিন পেরোলেই ভয়। সেদিন পটলা বাগ্দীর পেছনে লেগেছিলো ঐ মোল্লার ভিটের তফাতে। তাই বলছিলুম সাবধান হওয়া ভালো।"

বড় কর্তা হেসেই বাঁচে না। তার উৎকট হাসির শব্দে যশাইয়ের ঝোপ থেকে একদল শেয়াল সর্-সর্ করে দৌড়ে পালাল।

"মা যশাইয়ের কাছে যেমন ট্যাঁ-ফুঁ চলে না, তেমন চলে না এই শর্মার কাছে। মনি সরকার ওসব জিন-পরী, ভূত-পরী, ভূত-পেত্নীকে রেয়াত করে না কোনদিন। সে সব তো তুই জানিস। এই তো সেদিনের কথা।"

শওকত গল্পের মওকা পেয়ে খুশীই হল। সরকার-বাড়ির বড় কর্তা এমনিতে কথা বলে কম, রসের নেশায় থাকলে আবার মাত্রা থাকে না তার। মওকা পেয়ে শওকত বলল, "একটু দেরী হবে মনে হচ্ছে। উঠে এস কাকা। না হয় বিহানে চাচা-ভাজতা একসাথে ফিরবো।"

"মন্দ বলিসনি। কিন্তু তোর কাকী ভেবে হয়রান হবে শওকত।" কিছুক্ষণ থেমে বলল, "হোক্ গে, তাই বলে জিন-পরীর কেচ্ছা না বলে যেতেও পারব না।"

বড় কর্তা ডিঙিতে উঠে বসল।

"বালিশ আছে রে?"

বালিশ! শওকত মনে মনে বোধ হয় হাসল। ছইয়ের তলা থেকে তেলচিটে কাঁথা বের করে জড়িয়ে বালিশের মত করে এগিয়ে দিল। বড় কর্তা জুত-সই মত মাথার তলায় বাগিয়ে নিয়ে বলল, "তারপর শোন। সেবার মড়ি-ঘরের পাশ দিয়ে আসছিলুম। জেলখানার পেটা-ঘড়িতে বারটা তখন বেজে গেছে। খানিক পর উজাল মোক্তারের আম-বাগানের পাশ দিয়ে আসতে আসতে দেখলুম! ওঃ—তুই দেখলে ভিরমি খেতি।"

শওকত বড় কর্তার গা ঘেঁষে বসল।

"দেখলুম জ্যোৎস্নার আলোতে। একটা লোক বস্তা মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই দোমাথা নারকোল গাছতলায়। হেঁকে ডাকলুম কে, কে দাঁড়িয়ে?"

"জবাব এল না। গা-টা ছম্ ছম্ করে যে না-উঠলো এমন নয়। হাতের লাঠিখানা বাগিয়ে ধরে আবার বললুম 'জবাব দাও' নইলে—"

"জবাব না দিয়ে লোকটা চলতে শুরু করল।"

"ভাবলুম চোর। আম চুরি করে পালাচ্ছে। ছুটলুম পেছু-পেছু। সেও ছুটছে আমিও ছুটছি। বন-বাদাড় ভেঙে কোথায় যে যাচ্ছি তা নিজেই জানি না। শেষ রাতের আশমানি তারা জ্বল-জ্বল করে উঠতে হুঁস হল, আর ঘণ্টা খানেকের মধ্যে বিহানের আলো দেখা দেবে। তখন কোথায় পালাবে বাছা!"

শওকত নারকোলের ছোবড়া পাকিয়ে মালসায় আগুন জ্বালালো। শেষ রাতে নেশাটা যাতে জমাট হয় তারই জন্য কল্কেতে ভালো করে দা-কাটা তামাক ভরতে লাগল।

"তারপর শোন! লাঠিটা বাগিয়ে ভাবলুম, দেই শালার ঠ্যাং ভেঙে। ভাল করে চাইতে দেখি তার কোন পা-ই নেই, শূন্যে সে ধড়টা নিয়ে উড়ে চলেছে।"

শওকত 'হুঁ' দিয়ে কল্কেতে একমনে ফুঁ দিতে লাগলো।

"ভারী কড়াতো তোর তামাক।"

"দা-কাটা কিনা।"

"আর সুখ-টান দিতে হবে না। ট্যাকসো বসছে, বুঝলি?"

"তামাকে ট্যাকসো!" অবাক হয়ে শওকত জিজ্ঞেস করল।

"তাই তো শুনলাম। বাঁচা গেল বাপু। এবার জরু-বিবির ওপর ট্যাকসো বসলেই বাঁচি।"

শওকত কথার মোড় ফেরাতে জিজ্ঞেস করল, "সেই বস্তার কি হল কাকা।"

"ওঃ, ভুলেই যাচ্ছিলুম। যেমন দিলুম এক ঘা, কোথায় গেল দানা-দৈত্য, রইলো শুধু আমের বস্তা। আমার নাম মনি সরকার। আবার এলে বুঝবে বাছাধন।"

"কিন্তুফিন্তু নেইরে। আসলে বুকে জোর থাকলে সব দানাই দানা পাকিয়ে মিছরী হয়ে যায়।"

নিজের রসিকতায় বড় কর্তা হো-হো করে হেসে উঠল।

শওকত নিজের মনে তামাক টানতে টানতে জিজ্ঞেস করল, "অষ্টম বোষ্টমির মামলাটা কি হল কাকা?"

জড়িত কণ্ঠে জবাব এল, "অষ্টম!"

বড় কর্তার চোখ জড়িয়ে এসেছে। কাঁথার পোটলা মাথায় দিয়ে নাক ডাকতে শুরু করেছে। অষ্টমের কাহিনী বলবার মত অবস্থা তখন নয়।

অনেক দিন থেকেই শওকত অষ্টম বোষ্টমির মামলার খবর খুঁজছিল। লক্ষ্মীকোলের হাটে শওকত বরাবর মাল নিয়ে যেত।

সেখানেই অষ্টম বোষ্টমির নাম শুনেছে, দু'চার বার দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে, পরিচয়ও হয়েছে।

গৌরাঙ্গী, নাকে রসকলি, কপালে তিলক, গলায় তুলসীর মালা। কোথায় বাড়িঘর কেউ জানতো না। কবে এসেছে তাও মুরুব্বীরা ছাড়া বলতে পারে না।

অষ্টমের একদিন রূপও ছিল, যৌবনও ছিল, ছিল তার তীক্ষ্ণতা। পড়তি বয়সে তার জৌলুস ছিল না, ছিল শুধু পড়ন্ত বেলার আভা। কবে সে খুঁজে নিল খঞ্জনি, গলায় দিল তুলসীর মালা, কণ্ঠে নিল হরিনাম, তাও কারও জানা নেই। এখন সে দুয়োরে দুয়োরে গান করে বেড়ায়।

পাড়ায় পাড়ায় তার নাম রয়েছে। গাঁয়ের বউ-ঝিয়েরা ডেকে বলে, "ওগো, ও বোষ্টমির বিটি, তোমার সেই গানটা শোনাও না।"

বোষ্টমির খঞ্জনি টুন্ টুন্ করে বেজে ওঠে। তার ঠোঁটের হাসি আর কণ্ঠের গান মাতিয়ে তোলে সবাইকে। বোষ্টমির বড় খাতির। সাত-গাঁয়ের বউ-ঝিয়েরা সিধে সাজিয়ে দেয় তাকে।

শওকতের ডিঙিতে পারাপার করেছে বহুবার। শওকত ফেরীর পয়সা চায়নি কোনদিন, একদিন শুধু শুনতে চেয়েছিল তার গান। যশাইতলার ঘাটে ডিঙির গলুইতে বসে অষ্টম ধীরে ধীরে আঙুলের আঘাত দিল খঞ্জনিতে।

শওকত অবাক হয়ে তার আঙুলের দিকে চেয়ে থাকে।

অষ্টম গাইতে থাকে, "হায় যমুনা, কোন তরীর নাইয়া সেজে—"

অষ্টম গান শেষ করে আঁচলে মুখ মুছে হাসল।

শওকতও হাসল।

"বোষ্টমদি, কোথায় এমন গান শিখলে ?"

শওকতের প্রশ্নটা হঠাৎ অষ্টমের মুখে চিন্তার ছায়া এঁকে দিল। খঞ্জনিটা ঘাড়ের সাথে ঝুলিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তুমি শিখবে নাকি পাটনীর পো ?"

শওকত লজ্জা পেল, নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "সে সুবিধা কি হবে বোষ্টমদি ?সকাল বেলায় বৈঠা হাতে নিই বদর-বদর বলে, রাতের বেলায় বৈঠা নামাই আল্লার কুদরত ভেবে।"

ডিঙি থেকে নামতে নামতে অষ্টম বলল, "তা হলে বৃন্দাবনে যাবে কি করে, সেখানে না গেলে তো গান শেখা হবে না। সোনার শ্যাম তোমার গান না শুনলে মানুষ কেন শুনবে? সেদিন বৈঠার হাত খুলবে যেদিন শ্যাম তোমার গীত শুনবে, সেদিনই তুমি শ্যামের গীত গাইবে, তার আগে নয়।"

অষ্টম যশাইতলা পেরিয়ে ধলাটগাঁয়ের পথে এগিয়ে গেল। শওকতের ইচ্ছা হল পেছন থেকে বোষ্টমদিকে আর একবার ডেকে আরও একটা গান শোনে। তার নিজের গান শ্যাম নাই-বা শুনল, বোষ্টমদির গান নিজে শুনে শ্যামের আস্তানা সে খুঁজে বের করবে। ডাকতে সে পারল না। আপনা থেকে শব্দ আটকে গেছে তার গলায়। অষ্টম ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল যশাইয়ের ঝোপে।

আরও কতবার অষ্টম এসেছে তার পারঘাটায়। কিন্তু সে মুখ ফুটে আর গান গাইতে বলতে পারে নি। অষ্টমের সাথে তার পরিচয় ঘনিষ্ঠ না হলেও ফেলে দেবার মত নয়। সেই অষ্টম নাকি মরেছে! শুধু মরে নি, সকাল বেলায় পাড়া-প্রতিবেশী দেখতে পেল তার লাশ ঝুলছে আম গাছের মগডালে। জোয়ান নয়, বুড়ো-হাবড়া, কে মারল তাকে!

কেউ বলল, "আত্মহত্যা"; কেউ বলল, "খুন"।

পুলিস এল। গ্রেপ্তার হল দু'চারজন। কিন্তু অষ্টম বোষ্টমির কেচ্ছা শেষ হল না। তার পুঁজিপাটা বলাই সায়ের গদী থেকে বের করল পুলিস। টিপ দেওয়া ছোট এক টুকরো কাগজে তার পুঁজিপাটার দানপত্তর। সব দিয়ে গেছে জোয়ারের গোঁসাই-আশ্রমে। পুঁজির অঙ্কও কম নয়। নগদে-গয়নায় প্রায় সাতশ' টাকা।

জোয়ারের গোঁসাই-আশ্রম পুরানো নয়। বাবুদের মেজ কর্তা অনেক দিন বৃন্দাবন বাস করে হঠাৎ এসে এই আশ্রম খুলে বসল। সকাল-সন্ধ্যেয় হরিনাম আর মালসা ভোগ, যেন একটা মহোৎসব। শওকত যায়নি কখনও, শুধু শুনেছে। সেই মেজ কর্তাই আশ্রমের গোঁসাই। বয়স ষাটের ওপর, গায়ের রং মেটে-মেটে, চোখের চাহনি ফেটে পড়তে চায়। নিজের ভাগের সব সম্পত্তি দান করেছে আশ্রমকে। তাই আশ্রম তার জমজমাট, ভক্তের অভাব নেই।

অষ্টমের দানপত্তর কায়েম করতে গিয়ে তবেই তো জানা গেল। ভেতরে ভেতরে কত কথা ঢাকা থাকে, হঠাৎ কোন গোলমাল না হলে গোপন সমাচার বাইরে আসে না। অষ্টমের মরণের পর মেজ কর্তার সব কথা জানা গেল।

শওকত অবাক হয়ে শুনল, মেজ কর্তাই নাকি অষ্টমের স্বামী।

সে আবার কি! বোষ্টমির স্বামী কিরে বাপু!

খবর ওড়ে হাওয়ার মুখে। অষ্টমের মরার খবর পেয়ে গোঁসাই এল। গোঁসাই কেঁদে আকুল। তখনই তো জানা গেল সব।

বোষ্টম-বোরেগীর প্রথামত অষ্টমের সমাধি হল জোয়ারের আশ্রমের আঙিনায়। গোঁসাই বাঁধিয়ে দিল সমাধির চারপাশ।

মামলার শেষ হয়নি তবুও।

শওকত আর খবর পায়নি। মাঝে মাঝে মামলার খবর জানার বড়ই ইচ্ছে হয় তার। পারাপারের অনেক সোয়ারীকে জিজ্ঞেসও করেছে। কেউ বলতে পারে না। বছর পেরিয়ে যেতেই সবাই ভুলে গেছে তার কথা।

বড় কর্তার তখন নাকডাকার ঘটা। শিমুল গাছের মাথায় 'ওয়াক—ওয়াক' করে ডেকে উঠল উক্‌কুস পাখি। আর প্রহরটেক রাত রয়েছে মাত্র।

হুঁকোটা নামিয়ে শওকতও ঝিমুতে থাকে।

পুবের আকাশে লাল আভা দেখা দিতেই শওকত ধাক্কা দিয়ে বড় কর্তার ঘুম ভাঙিয়ে দিল, "বিহান হয়ে গেছে কাকা।"

বড় কর্তার নেশার ঝোঁক কেটে গেছে। চোখ রগড়ে উঠে বসেই বলল, "দে মাছের রুমাল।"

শওকত রুমাল তুলে দিতেই বড় কর্তা জিজ্ঞেস করল, "কত দাম দেব?"

শওকত হেসে বলল, "আমি কি নিকারি? নিকারি মাছ বেচে, আমি তো মাছ বেচি না কাকা।"

বড় কর্তার মস্ত ভুল হয়ে গেছে। ঝোঁকের মাথায় জিজ্ঞেস করে নিজেই লজ্জিত হল। বলল, "তোর মেহনতি মাল।"

বড় কর্তা নিজেই জানে দাম নেওয়াটা শওকতের পক্ষে অসম্ভব, আবার দাম দেওয়াটাও তার পক্ষে অশোভন।

শওকত তাকে লজ্জা থেকে মুক্তি দিল। বলল, "দুপুরে পাতা পাতব, বড় কাকিকে বলে রাখবেন, কেমন?"

বড় কর্তা ডিঙি থেকে নেমে সোজা পথ ধরল।

সরকার-বাড়ির নুন খেয়েই শওকত বড় হয়েছে। এই বড় কর্তা যখন জন্মালো তখন শওকত সরকার-বাড়ির রাখাল। তারই কোলে-পিঠে বড় হয়েছে বড় কর্তা। শুধু সেই বা কেন, সরকার-বাড়ির সবাই তো তার কোলে-পিঠে বড় হয়েছে। তাকে বাদ দিয়ে তো আজও সরকার-বাড়ির কোন কাজকর্মই হয় না। এই তো সে দিনের কথা। সোঁতার ঘাট থেকে সরকার-বাড়ির জোলা অবধি কলাগাছ পোঁতা হয়েছে, বসানো হয়েছে মাটির মঙ্গলঘট। সরকার-কর্তার বড় ছেলের বউ আসবে। শওকতের ডিঙিও সাজানো হয়েছে, ডিঙির পাটাতনে তুলোর তোষকে নতুন বউ এসে বসতেই শওকত রসাল করে বলল, "আজ থেকে তুমি আমার বড় কাকি, কেমন? মনে থাকবে তো ভাজতাকে?"

নতুন বউ ঘোমটা আরও একটু টেনে দিল। জবাব দেবে কি, লজ্জায় সে রাঙা হয়ে উঠেছে।

"কই বড় কাকি জবাব দাও। মা মনসার মত ফোঁসাচ্ছ কেন?"

সরকার-কর্তা মারা গেছে কত কাল। সেদিনের বড় কাকি আজ ঘরণীগিন্নী। অথচ বড় কাকি আজও সেই প্রথম দিনের রসাল কথা ভোলে নি। বড় কর্তাও মাঝে মাঝে সে কথা মনে করিয়ে দেয়।

তারপর কত বছর পেরিয়ে গেছে। শওকত আর রাখালি করে না। বড় কর্তার তদ্বিরে পারঘাটার ইজারা পেয়েছে। হাজার হাজার ঝড়-ঝাপটার মধ্যেও কয়েক বিঘে জমি সংগ্রহ করে পেটের চিন্তা থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে অনেকটা।

এই বাড়ির ছোট কর্তার বিয়ের পর প্রথম গাঁয়ে আসার উৎসব। আগের মতই ডিঙি সাজাতে হয়েছে শওকতকে। বউ আসছে শহর থেকে। কানাঘুষা সেও শুনেছে, এ বউ নাকি মেম-বউ। হারানকর্তা লোক ভাল। লেখাপড়া শিখে নাকি জজের আদালতে চাকরি পেয়েছে; কেউ কেউ বলে জজ হয়েছে। তা হোক বাপু! অমন সোনার ছেলে, জজ না হয়ে লাট হলেই বা ক্ষতি কি। নেহাত দারোগাগিরি তার প্রাপ্য, একথা শওকতও বোঝে। সেই হারানকর্তার বউ আসছে। বিয়ে হয়েছে পশ্চিম দেশে। দু'বছর বিয়ে হলেও বউ নিয়ে সে আসেনি কখনও। গাঁয়ের নতুন বউ, তা বলে আনকোরা নতুন নয়। তবুও ঘাট সাজাতে হবে। লায়েক ছেলের বউ হলে অনেক কিছুই করতে হয়।

সোঁতার ঘাট থেকে আবার কলাগাছ পোঁতা হয়েছে। মাঙ্গলিককে সম্পূর্ণ করতে কচি আমপাতার ঝালর টাঙান হয়েছে, আবার নতুন কলসীতে জল ভরে সিন্দূরের আলপনা দেওয়া হয়েছে। হারানকর্তার বউ আসছে।

কাল দুপুর নাগাদ পাল্কি পৌঁছাবে ঘাটে। ঘাট থেকে বরাবর হেঁটেই বার-বাড়ির উঠোন পর্যন্ত সবাই যায়, শুধু নতুন বউ ডিঙিতে

ওঠে। এ রেওয়াজ চলে আসছে অনেকদিন থেকে। নতুন বউ বাড়ির ঘাটে পা দেবে, আর কোথাও নয়।

ছোটবেলায় সরকার-গিন্নীর কাছে হারানকর্তার গুণপনা শুনেছে সবাই। ছেলে তার জজ হবে, না হলে ম্যাজিস্তর।

শওকত শুনেছে লাটসাহেব নাকি জজের খাতা থেকে হারান-কর্তার নাম কেটে দিয়েছে। আফিঙখোর লাট সাহেবকে নাকি ইনাম দিতে পারেনি। তাই জজ না হয়ে জজের আদালতে তাকে কাজ করতে হচ্ছে। কি চাকরি তা কেউ জানে না। কোথায় কোন পশ্চিমাদের দেশে চাকরি করছে, সেখানেই সে থাকে। উর্দিপরা যে চৌকিদার ক্রোক করতে আসে দেনাদারের স্থাবর অস্থাবর, সেও নাকি জজের আদালতে কাজ করে, হবেও বা তাই। অত শত শওকত জানেও না, দরকারও হয় না। হারানকর্তা ভাল লোক, সরকার-গিন্নীর সর্বকনিষ্ঠ সন্তান।

ঢোল কাঁসিতে ঘা পড়তেই শওকত ঘাট ছেড়ে সরকার-বাড়ির আঙিনায় নিত্য হাজিরা দিয়ে আসছে। বউ আসবে, উৎসব শুরু হয়েছে বউ আসবার ছ'দিন আগে থেকে। দু'বেলায় পঞ্চাশটা পাতা পড়ছে আঙিনায়। দেখতে দেখতে স্বজন-দুর্জনে বৈঠকখানা ভর্তি হতে থাকে।

দেড়গণ্ডা বউ-মেয়ে এসেছে গেছে সরকার-বাড়িতে শওকতের ডিঙি চড়ে। এত হৈ-হাঙ্গাম তো সে কখনও দেখেনি। চারিদিকে সাজ সাজ রব। রোজ বিহানে মুনীষ যায় শহরে সওদা আনতে, রোজ সাঁঝে এক-দুই করে আত্মকুটুম এসে পৌছায় সরকার-বাড়িতে। বড় কর্তা আর রাত করে না, সাঁঝের বাতি জ্বলতে না জ্বলতে শহর থেকে গাঁয়ে এসে ওঠে, আবার আকাশ ফাঁক হতে না হতেই রওনা হয় শহরে। সারা গাঁয়ের ভাল-মন্দ সব মানুষ এসে পাতা পাতছে আঙিনায়, এ যেন মহোৎসব।

গোলার সামনে দাঁড়িয়ে বড় কাকি ধান মেপে দিচ্ছিল। গুটি গুটি শওকত এসে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করল, "এত জোলুস কেন

বড় কাকি ? এর আগে তুমি এসেছ ঘরের বড় বউ, কই এমন তো হয়নি তখন। স্মরণকালে সরকার-বাড়িতে এত উৎসব, এত জমজমা চোখে পড়েনি কখনও।"

নিশ্চিন্দি ঠাকরেনের বিধবা মেয়ে ফোড়ন কেটে বলল, "তোমার কথায় তো মনে হচ্ছে, তোমাদের বউ আসছে পটের বিবি। পটের বিবি দিয়ে তোমাদের কি হবে, সে বাড়াও বানবে না, চিড়েও কুটবে না।"

শওকতের সহ্য হল না, তার মুখের ওপর বলে দিল, "আমাদের হারুই বা কম কিসে, তার বউকে ধান ভানতে হবেই বা কেন! ধান ভানা যাদের কপাল তারা তেমনি ঘরেই আসে।"

নিশ্চিন্দ ঠাকরেনকে কে না জানে ? তার গলা জানে না এমন লোক সে তল্লাটে নাই। তারই মেয়ে পুতিরানী মাকেও হার মানিয়েছে হরেক গুণে। অন্তত তার সুনাম দুর্নামের যে ভয় নেই সে কথা সবাই জানে। এই তো ক'মাস আগে গলার ব্যথায় শহরের হাসপাতালে গিয়েছিল, লোকে বলে লুকিয়ে মাছের মুড়ো খেতে গলায় কাঁটা ফুটেছিল। এহেন পুতিরানী শওকতের মত লোকের কথা সহ্য করবে কেন! শওকতের কথায় ফোঁস করে উঠল সে, বলল, "একি তোদের মোছলমানের বিয়ে, সোয়ামি মরলে সাত নিকে!"

"তাও ভাল", বলে শওকত গর্জে ওঠে।

বড় কর্ত্রী মাঝখানে এসে যদি না থামাতো তা হলে কি কুরুক্ষেত্তর যে হত তা ভাবাও যায় না।

বড় কর্ত্রী ধমকে উঠল, "শও-বেটা!"

মাথা নীচু করে শওকত বার-বাড়িতে এসে দাঁড়াল।

রাতের বেলায় শওকত ডিঙি সাজানো আরম্ভ করল। সামনের গলুইতে পেতলের চোখ লাগাল, বাটা-হলুদে ছুপিয়ে দিল গলুইয়ের ডগা, সিঁদুর দিয়ে রাঙিয়ে দিল নৌকার দু'পাশ। তেল-রঙে নকশা আঁকলো হালের বৈঠায়, পাটাতনে বিছিয়ে দিল শুকনো খড়ের গদি,

তার ওপর তুলোর তোষক আর সাটিনের চাদর। রঙীন কাগজের ফুল-ঝালরে সাজিয়ে তুললো ছইয়ের দুটো মুখ।

ডাঙায় দাঁড়িয়ে পরখ করল সুন্দর লাগছে কি না? যেটুকু তার চোখে কটূ লাগলো সেটুকু আবার বদলে দিল। এমনি করে সাজিয়ে তুললো তার ডিঙিখানা। হারানকর্তা আসবে তার কুঁচবরণ পত্নী কাঁকনমালাকে নিয়ে। বরণ করে ডিঙায় তুলতে হবে শওকতকে। এমনি ধারা তিরিশ বছর ধরে আসার পথে বরণ করতে হয়েছে সরকার-বাড়ির নতুন বউদের, বিদায় দিতে হয়েছে সরকার-বাড়ির মেয়েদের।

সাজানো ডিঙির দিকে অপলকে চেয়ে থাকে শওকত মাঝি। সে নিজে কখন ভাবতেও পারেনি এমন সুন্দর করে ডিঙি সাজাতে পারে। আজ যেন রূপের গরবে তার ডিঙিখানা হেসে উঠছে। শওকত অনিমেষ নয়নে ডিঙির দিকে চেয়ে থাকে। মাঝে মাঝে মা-যশাইয়ের নাম নিয়ে সেলাম জানায়।

এমনি ধারা আরও একবার সাজাতে হবে যেদিন আসবে তারই ছেলে নতুন বউ নিয়ে। মধুকর নাইয়া না থাকলে কি হয়, শওকত ব্যাপারী তো রয়েছে, আর রয়েছে তার পুরানো দিনের সবল মনটা, সঙ্গে আছে তার হারিয়ে-যাওয়া দিনের মধুমাখা স্মৃতি।

হাতের কাজ সেরে সরকার-বাড়ির আঙিনায় বসে একছড়া বিচি-কলা নিয়ে কেবল এক সানকি চিঁড়েতে জল দিয়েছে এমন সময় খবর এল হারানকর্তা পৌঁছে গেছে। হন্ত-দন্ত হয়ে শওকত ছুটে এল খাওয়া ছেড়ে। এমনি করে সরকার-বাড়ির নানা কাজে তাকে ছুটতে হয়েছে মুখের খাবার রেখে। এর জন্য আপসোস তাকে করতে হয়নি কখনও, দোষারোপ করেওনি কাউকে। এটা তার প্রাপ্য, মেনে নিয়েছে ইমানদার হিসাবে, নিজেকে নিমকহালাল ভেবে। শওকত দৌড়ে এল ঘাটে।

হারানকর্তা বউ নিয়ে উঠল ডিঙিতে।

নতুন বউ দেখে খুশির দাপটে শওকত হাঁপিয়ে উঠল।

ওদিকে বারোহাটের নমোর দল এসেছে। ও তল্লাটে ওরাই নাম-জাদা কীর্তনীয়া। তাদের গরাই বিশ্বেস যখন মাথুর শুরু করে তখন শ্রোতার দল হাপুস নয়নে কাঁদতে থাকে, বোধ হয় আনন্দের আতিশয্যে। চিকের আড়ালে বসে ফুঁপিয়ে ওঠে মেয়ের দল। শওকত বারোহাটের কীর্তন শুনতে কাজ কামাই করেছে অনেকবার, ভিনগাঁয়ে পথ হেঁটে গায়ে ব্যথাও হয়েছে বহুবার। আজ সেই কীর্তনীয়া আসবে,—হারানকর্তার বউ আসবে, তারাও আসবে কীর্তন শোনাতে।

এবার নাকি নতুন দল গড়েছে ঋষির গাঁয়ের ঘোষেরা। তারাই নাকি সেরা কীর্তনীয়া। হবেই বা না কেন? স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ওদের ঘরেই জন্মেছিলেন। রক্তের গুণেই ওদের কীর্তন—সেরা কীর্তন, মহড়া নেবার সাধ্য কার! তাদের কাছে হার মেনেছে নমোর দল। গরাই বিশ্বেস নাকি নিজেই বলেছে, গয়লা-বাড়ির নিধু বয়সে ছোট হলে কি হবে, তার গলার কাছে শ্যামের বাঁশিও হার মানে।

নমোরা তা স্বীকার করে না। তারাও তো নারায়ণী সেনার বংশ। তাদের কাছে হার মানতে হবেই হবে, তারাও ঘোষেদের দুয়ো দেবেই দেবে। তারাও এসেছে হারানকর্তার নতুন বউকে সওগাত দিতে। এবার পরীক্ষা হবে কাদের দলের কত ক্ষমতা। আজ রাতেই হবে কীর্তনীয়ার লড়াই। শওকত ডিঙি সাজাতে বসে ভুলেই গিয়েছিল কীর্তনের কথা, হারানকর্তা আসতেই খুশিতে মন ভরে উঠল তার। নতুন বউ, নতুন কীর্তন সব দিকেই তার আনন্দ। তার ওপর সকাল বেলায় বড় কর্তা বলছিল, ডহরপুরের পালান মণ্ডলের পুতুল নাচও নাকি আসবে। শহুরে বউ, পুতুল নাচ তো দেখেনি কখনও, তাই পুতুল নাচের বন্দোবস্ত করতে চেয়েছে বড় কর্তা। তাও হতে পারে। বড় কর্তা তো কখনও বাজে কথা বলে না, পুতুল নাচ হতেও বা কতক্ষণ। কর্তাদের খুশিতে দেশজোড়া লোক খুশী হয়।

পুতুল নাচ সে অনেকবার দেখেছে। রাবণ রাজা মাটিতে পড়ে 'হা-রাম, হা-রাম' চিৎকার করে উঠলে শওকতের চোখ জলে ভরে ওঠে, গাল বেয়ে টস টস করে জল পড়তে থাকে। রামের চেয়ে

রাবণকে তার ভাল লাগে বেশি। হাঁ মরদের মত মরদ! বউয়ের আঁচল ধরে কেঁদে বেড়ায় না। রাজা-বাদশাহ ওকেই বলে। বাদশাহ রাবণ মাটিতে গড়াতে থাকে, শওকত ভাবতে থাকে, হায়রে অতবড় রাবণ রাজা সেও মাটিতে পড়ে 'পানি, পানি' করে রোয়াব ছাড়ে! হায়, হায় বাদশাহ-রাজা, যাদের কদম মাটিতে পড়ে না কোন কালেও, সেই বাদশাহ-রাজারাও মাটিতে পড়ে কেঁদে কঁকিয়ে বাঁচে না!

নোয়াপাড়ার হাজিসাহেবের কাছে শুনেছে 'আবে জমজম'এর পানি আনতে মিশরের সুলতান হাঁটতে হাঁটতে হর বছর মক্কায় আসে, সে বিনে কোন সুলতান নাকি জমিতে কদম রাখেনি কোনদিন। রাবণ সুলতান হয়েও মাটিতে পড়ে নিজেরই দুশমন রামের সাথে মোলাকাত করতে চায়। এর চেয়ে বদ নসীব আর কিছু আছে!

ডিঙিতে বসে বসে শওকত পুতুল নাচের কাল্পনিক দৃশ্যগুলো ভাবতে ভাবতে মশগুল হয়ে যায়।

নতুন বউকে ঘাটে নামিয়ে ফিরে এল পারঘাটায়। সেখানে ফিরেও পুতুল নাচের কথা ভুলতে পারে না শওকত। সাঁঝের আঁধার কখন যে নামবে! সে ভাবছে আঁধার নামলেই ডিঙিটাকে খুঁটোয় বেঁধে ছুটবে সরকার-বাড়ির আঙিনায়।

তিন

পুতুলনাচের কথায় শওকত খুব খুশি হয়েছে এমন নয়, তবুও কেমন যেন মোহ। নতুন বউ পুতুল নাচ দেখবে এতেই তার বেশী আনন্দ। গাঁয়ের মানুষ যা ভালবাসে শহুরে মেয়ের কি তা ভালো লাগবে! তবুও তো তাকে দেখতে হবে, বসতে হবে গরীব গাঁয়ের গরীব মেয়েদের সাথে। এইটে বোধ হয় তার বড় পরিতৃপ্তি।

একবার পুতুল নাচ দেখে বাড়ি এসে বউকে বলেছিল, "আমি মরলে তুই কি করিস পরী?"

পরীর তখন জোয়ান বয়স, উঠতি জীবন, ভরাজীবনের ইঙ্গিত তখন দেহের কানায় কানায়। শওকতের লক্ষ্মীছাড়া কথা শুনে সে খেঁকিয়ে উঠল।

"শত্তুর মরুক, দুশমন কবরে যাক, তুই মরবি কোন্ দুঃখে ?"

"তা বলছি না, রাবণরাজা মরল কি না !"

"তাই বল, তুই পুতুল নাচ দেখে এলি। তোর কথার ঢঙে আমার জান বেহাল হবার জোগাড়। রাবণরাজা মরলে আমার কি এসে গেল !"

পরীজান দাওয়ায় চাটাই বিছাতে বিছাতে বলল, "দেহটা ভাল লাগছে না, ঝড়বৃষ্টির দিন।"

অল্প কথায় শওকতকে সব কথা জানিয়ে দিয়ে পরী নিজের কাজে মন দিল।

পরীজানকে বিয়ে করে গোবিন্দপুরের মাঠ দিয়ে যখন আসছিল, পরীর বয়স তখন এগারো আর শওকতের বয়স আঠারো। ছ'কুড়ি টাকা মোহরানা কবুল করে পরীকে ঘরে এনেছিল। সেই দিন থেকে চোখের আড়াল হতে দেয়নি একটি দিনের তরেও। কাছ-ছাড়া না হয়ে পরীরও আহ্লাদেপনা বেড়ে গেছে। পাঁচ বছরেও পরীর কোলে ছেলে এল না। পরী হা-হুতোশ করে মরে। ছ'বছরের মাথায় পরীর রূপ ফেটে পড়তে লাগল। শওকত তামাশা করে বলল, "তোর হল কি পরী ?"

পরী বুঝতে না পেরে বলল, "কই কিছু তো হয় নি।"

"আরশি দিয়ে মুখখানা দেখেছিস ?"

"ওঃ, তোর আবার সোহাগ বাড়ল দেখছি, এই সেদিন বললি, আবার নাকি নিকে করবি, আর আজকে তোর চোখ টাটাচ্ছে।"

"নিকে বললেই নিকে! তোকে ঠাট্টা করেছিলাম, তাও বুঝিস না। সরকার-বাড়ির বড় কর্তারও তো ছেলে হয় নি, সেকি নিকে করেছে !"

"আসলে ট্যাঁকে তোর পয়সা নেই। নইলে—"

শওকতের মনে ভেসে ওঠে চলে-যাওয়া পাঁচ বছরের সব কথা। পয়সা থাকলে সত্যিই কি সে নিকে করত! হয় তো করত। কিন্তু এ সেই পরীজান যে গোবিন্দপুরের মাঠে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, "তুই আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস, আমি তোর সাথে যাব না, আমি বা'জানের কাছে ফিরে যাব।"

বিয়ে যে কি শওকত নিজেও বুঝত না। সরকার-বাড়ির রাখালি ছেড়ে সবে সে পারঘাটার ইজারা পেয়েছে। সেই সাথে সরকার-বাড়ির বুড়ো কর্তাই তার বিয়েও ঠিক করে দিয়েছে। ছোট এই খুকিটা তার ভাত রাঁধবে, পায়ে তেল মালিশ করবে, ঘর নিকোবে এই টুকুই সে জানে। বাড়িতে কাজ করবার লোক চাই, নইলে পারঘাটার ভাত দেবে কে? আগে রাখালি করত, সরকার-বাড়িতে খেতে পেত, রান্না করবার দরকার হত না। পারঘাটার কাজ পেয়ে সেটাও হচ্ছে না। ডিঙিতেই তোলা উনুন করে নিয়ে আজকাল ভাত ফুটিয়ে নেয়। এত ঝামেলা শওকতের ভাল লাগে না। তাই বিয়ে করতে সে রাজি হয়েছিল।

পরীকে জিজ্ঞেস করেছিল, "তুই কি বাপ ছেড়ে থাকতে পারবি না?"

পরী উত্তর না দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

রাগ করে শওকত বলল, "তা হলে তুই ফিরে যা, প্যানপ্যানানি ভাল লাগে না বাপু। বউ আমার দরকার নেই, ডিঙি-বৈঠা থাকলেই হল।"

পরী ফিরতেও পারে না। আজন্মকাল শুনে আসছে মেয়েদের বিয়ে হলে স্বামীর ঘর করতে হয়। সে তা করবে। কিন্তু স্বামীর ঘর যে কি তা তো সে জানে না। সামনের ঐ জোয়ান মানুষটা তার স্বামী। বিয়ের পর উকীল দাঁড়িয়ে কবুল করিয়ে গেল। সে একবার মাত্র লোকটার মুখের দিকে চেয়ে দেখেছিল। মনে হল, লোকটা মন্দ নয়।

পরীকে নিয়ে সোজা এসে উঠল সরকার-বাড়ির আঙিনায়। বুড়ো কর্তা বউ-এর মুখ দেখে আলপাকার শাড়ি দিয়েছিল, পরী সেখানা যত্ন করে আজও তুলে রেখেছে। তখন সরকার-বাড়ির সব কর্তাই ছোট ছোট। ছোট তরফের যোগেন্দির শুধু তার সমবয়সী, তারও বিয়ে হয়নি তখনও, পরের বছর যোগেন্দির বিয়ে করে এল। কি ধূম-ধাম, তার ডিঙি করেই যোগেন্দিরের বউ এসে নামল আঙিনায়। সেদিনকার সেই পরীজান ছ'বছর ঘর করল। আরও কত বছর ঘর করতে হবে। সে সব কথা নিয়ে পরী মাথা ঘামায় না।

প্রথম প্রথম পরীজান কাঁদত, দু'তিন দিন রান্নাও করত না। শওকত কাঁচের চুড়ি, পুঁতির মালা এনে দিত। পরী না রাঁধলে নিজেই রান্না করে নিত। কোন কোন দিন দুপুরবেলায় কারুর হাতে ডিঙি দিয়ে লুকিয়ে বাড়ি আসত। বাড়ি এসে পরীকে খুঁজে বের করতে হয়রান হয়ে যেত। একদিন তো আমগাছের মাথা থেকে 'কু' দিয়ে পরী তাকে তাক্ লাগিয়ে দিয়েছিল।

নেমে আসতেই জিজ্ঞেস করল, "ঘরের বউ হয়ে ঐ গাছটার মাথায় চড়ে বসেছিস, গাঁয়ের লোকে দেখলে বেয়া বলবে।"

মুখ ঘুরিয়ে পরী বলল, "বলুক। গাছে কাকের বাসায় কোকিলের ছা ধরতে গিয়েছিলাম।"

"কোনদিন বা তোকে সাপে খাবে দেখছি।"

যেন কত মজার কথা, পরী হি-হি করে হেসেই বাঁচে না।

"সাপ! সেদিন কি হয়েছে জানিস, ঐ বড় পাইকোর গাছতলায় গরু বাঁধতে গিয়ে দেখি কুণ্ডলী হয়ে শুয়ে আছে এক মহারাজ। দৌড়ে বাড়ি এসে শলাই নিয়ে গেলুম। তখনও মহারাজ শুয়ে। দিলাম চারদিকে আগুন, আর যায় কোথায়। বেটার বদমাইসি শেষ।"

হি-হি করে হাসতে হাসতে শওকতের হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল সেই পাইকোর গাছতলায়।

শওকত কোন রকমে হাত ছাড়িয়ে বলল, "শোন পরী, কাল শহরে যাব ইজারার টাকা জমা দিতে, তোর কি চাই বল।"

"আমার!" মাথার ওপর ঘোমটাটা ভাল করে টেনে বলল, "আমি বউ মানুষ, আমার আবার কি চাই। তুই একটা ঝুন্‌ঝুনি আনিস আর সুষুমালতী, কেমন?"

"ঝুন্‌ঝুনি দিয়ে কি করবি?"

"রাতের বেলায় মরার মত যখন ঘুমোবি তখন তোর কানের কাছে বাজাব।" বলেই হাসতে হাসতে পরী ছুটে পালাল। শওকত খপ করে তার আঁচল চেপে ধরে পেছন পেছন ছুটতে লাগল। তু'জনেরই এসব কথা আজও মনে আছে।

সেই পরী মা হবে। শওকত তো ভেবেই বাঁচে না। পরী যদি মরে যায়। না, মরবে না। পুতুল নাচ দেখে এসে খুশী মনের খোলা কথা ঠাট্টা করে বলতেই যা খিঁচিয়ে উঠল। গোবিন্দপুরের মাঠ পেরোতে যে পরী অত কেঁদেছে, এ যেন সেই পরী নয়। শওকত ভাবল, সে মরে যদি জিন-দানা হতে পারত তা হলে দেখত কতটুকু ভালবাসা রয়েছে পরীর বুকে। পরী হয়তো আমতলায় বসে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদবে তখন গাছের মাথায় জিন-দানা হয়ে দেখতে থাকবে পরীর মজাটা। ভয় হত, তার মরবার পর পরী যদি আবার নিকে করে। তা হলে! গলা টিপে মেরেই ফেলবে। এত ভালবাসা সে যদি ভুলতে পারে তা হলে গলা টিপে মারতেই বা কতটুকু সময় দরকার। ভাবতে ভাবতে নিজেই হেসে ওঠে!

বদনাটা টেনে নিয়ে শওকত চোঁ-চোঁ করে জল খেতে থাকে।

"অত তিয়াস যদি লেগেছে তা হলে কিছু মুখে দিলেই পারতি।"

"তিয়াস মেটাতে পারলি কোথায়, এ তিয়াস মেটবার নয়।"

নিজের রসিকতায় শওকত হেসে ওঠে, পরী লজ্জায় ঘোমটা টেনে সরে যায়। এই সলজ্জ চাহনিটুকুর অপেক্ষায় শওকত যেন বসে ছিল।

"শোন পরী, শোন, পুতুল নাচ দেখতে যাবি। সরকার-কর্তা তোকে নিয়ে যেতে বলেছে।"

"মানষির নাচ দেখা শেষ হোক, তারপর তোর পুতুল নাচ দেখব।"

কথাটা শওকতও বোঝে, তবু বুঝেও সে বুঝতে চায় না।

নতুন কাকি এসেছে, আবার সেই পুতুল নাচ। সেদিন আর নেই, পরীর বয়স বেড়েছে, কাম্মু লায়েক হতে চলেছে। আবার সেই পুতুল নাচ এসেছে সরকার-বাড়ির আঙিনায়, পরী কখনও পুতুল নাচ দেখতে যায়নি, মানষির নাচ দেখা তার শেষ হয়নি।

হারানকর্তার বউ আসবে, আবার সেই পুতুল নাচ, আবার সেই হৈ-হট্টগোল।

ডিঙির গলুইতে বসতে না বসতে সব পুরানো কথা মিলিয়ে গেল মনের তলায়।

সরকার-বাড়ির ঘাটে ডিঙি এসে লাগল। জুতো পায়ে মটমটিয়ে হারানকর্তার আগে আগেই বউ নেমে পড়ল ডিঙি থেকে। নতুন বউ-এর চলনের দিকে চেয়ে থেকে শওকত দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

শওকতের আফসোস থেকে যায়। কাম্মুকে যেদিন বিয়ে দিয়ে আনতে পারবে, সেদিন তার প্রাণটা ঠাণ্ডা হবে।

কাম্মু ধীরে ধীরে তার আওতার বাইরে চলে গেছে। কেমন করে যে তার মনে খাঁটি মুসলমান হবার শখ জাগল, তা সে নিজেই জানে। শওকত ভেবেই পায় না কবে থেকে সে নিজেই খাঁটি মুসলমানদের দল থেকে দূরে চলে গেছে। মুসলমান চিরকালই মুসলমান, ধর্মে মুসলমান হলেও কর্মে সে খাঁটি বাঙালী, যেমন বাঙালী সরকাররা, ঘোষেরা। কাম্মু কি তার থেকে বেশী কিছু হতে চায়?

কদিন আগে কাম্মু এসেছিল, সাথে ছিল রহিম তর্কবিশারদ। রহিমকে কোনদিন সে চোখে দেখেনি, তার কথা শুনেছে, শুনেছে সে মস্ত পীর। তার পানিপড়া খেলে গোরের মরা লাফিয়ে ওঠে।

রহিমের কদর কাম্মুই বোঝে। তার খেদমত করতে করতে কাম্মু হয়রান, পরীজানও হয়রান, তবুও তার মন ওঠে না।

পাশের ঘরে শুয়ে শুয়ে রহিম নানা কথা জিজ্ঞেস করছিল কাম্মুকে। শওকতের কানে সব কথাই ছেঁচাবেড়া ভেদ করে পৌঁছাচ্ছিল।

রহিম বলল, "বে-নমাজির হাতের পানি না-পাক। সব মুসলমানকে নমাজি হতে হবে মিঞাভাই। সেদিকে নজর রেখ।"

"বলছি তো সবাইকে, শুনছে কই? অনেকে তো জীবনভর কখনও নমাজ পড়েনি।"

"তোবা, তোবা। ওদের হাতে পানি পর্যন্ত খেওনা মিঞাভাই। সমাজে আটক কর ওদের। আর কাফেরের হাতে ভাত খেওনা কখনও।"

শওকতের সহ্য হচ্ছিল না। সে পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগল। রহিমের কথা ভাল করে শোনবারও ইচ্ছে হচ্ছিল না।

সকালবেলায় উঠেই কাম্মু তার মাকে নিয়ে পড়ল।

"মা তোমায় নমাজ পড়তে হবে।"

"হবে!" পরীজান ভেবে নিয়ে বলল, "কিন্তু পড়তে জানিনা বেটা, শিখিয়ে দিতে হবে।"

কাম্মুও তাই চায়। সে বসল মাকে ওজু করাতে।

শওকত দাওয়ায় বসে বসে সব দেখছিল। পরীজানকে ওজু করতে দেখে সে খুশীই হল, ভাবল পরী একটা কিছু নিয়ে দিন কাটাতে পারবে। তবুও গত রাতের কথাগুলো তার ভাল লাগছিল না। হঠাৎ বলে উঠল, "কাম্মু, তোর তর্ক সাহেবের রাতের খানাপিনা ঠিক হয়েছিল তো?"

"হাঁ বা'জান। না হবার কি কারণ থাকতে পারে!"

"তোর মা আবার বে-নমাজি কিনা, তাই না-পাক পানিতে তার বদহজম হয়নি তো?"

কাম্মুর মুখ শুকিয়ে কালো হয়ে গেল।

"তোর তর্ক সাহেবকে জিজ্ঞেস করে আয় তার ঠাকুরদাদার বাবার নাম। জেনে আয় হিন্দুর ঘরেই তারা পয়দা হয়েছিল কি না!"

কাম্মু জবাব খুঁজে পেল না।

"কাফের যদি মোছলমান হতে পারে তা হলে কাফেরকে ঘেন্না করার মত দুর্বুদ্ধি তার কেমন করে হল। জিজ্ঞেস করে আয়। আমরা তো আর মক্কা মদিনা থেকে আসিনি, এই দেশেরই লোক। যারা কাফের তারাও আমাদের জ্ঞাতগোষ্ঠী।"

"তা বলে…" কাম্মু কি যেন বলতে চাইছিল, তাকে বাধা দিয়ে শওকত বলল, "আল্লার দুনিয়াতে পাক না-পাক বোঝা বড় কঠিন বেটা। না-পাক হয়েও তোর মা তোকে পেটে ধরেছে, সেই মায়ের পেটে জন্মেই তোর পাক হবার বুদ্ধি গজিয়েছে। সেই মায়ের ছোঁয়া পানি যদি না-পাক হয় তা হলে মাকে আর মা বলে ডাকিস না।"

কথা শেষ করে উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে শওকত বেরিয়ে গেল।

কাম্মু সেই যে রহিমকে নিয়ে চলে গেছে আর আসেনি। পরী বলছিল, "আজ শনিবার কাম্মু তো এল না।"

"নাই বা এল। যে ছেলে মাকে ইজ্জত দেয় না সে ছেলের না আসাই ভাল।"

পরী গোপনে কেঁদেছিল কিনা জানা যায় নি কিন্তু এরপর সময়-মত কাম্মু না এলে পরী কখনও অনুযোগ করেনি।

তবু সরকার-বাড়ির বিয়ের বরাত দেখে কাম্মুর বিয়ে দেবার কেমন একটা নেশা তার চোখে ছিল। কোনদিন ভরসা করে শওকত তাকে বলতে পারেনি, পরীকে দিয়ে জিজ্ঞেস করিয়েছিল, কাম্মু হাঁ-না কিছুই বলেনি।

হারানকর্তার বউ আসতেই নতুন করে কাম্মুর বয়স হিসাব করল, কাম্মুর বয়স হল উনিশ। এই বয়সে সেও বিয়ে করেছিল, এই বয়সে সেও রঙীন স্বপ্ন দেখেছে। তার ছেলের তা হলে বিয়ে দেবে না কেন! যুক্তির দিক থেকে তার কোন ত্রুটি ছিল না, কিন্তু বাস্তবরূপ দেবার মত সাহস তার ছিল না। ছেলে লায়েক হয়েছে। বিয়ে করা না করা তার খেয়ালখুশি আর মর্জি।

অনেক বলে কয়েও যখন পরী পুতুল নাচ দেখতে যেতে রাজি হল না তখন শওকত নেহাৎ অনুযোগের সুরেই বলল, "কমপক্ষে নতুন কাকিকে দেখে আসবি চল।"

"নাঃ। আমিও তো একদিন নতুন বউ ছিলাম, নতুন বউ কাকে বলে, বউ নতুন হলে কি হয় তা আমার জানা আছে। তুই দেখগে, আমার দরকার নেই।"

হাল ছেড়ে দিয়ে শওকত হুঁকো নিয়ে বসল। এসব পুরানো দিনের কথা। পুরানো মন তার আর নেই, দেহটাও ধীরে ধীরে পুরানো হয়ে এসেছে। মনেরও সামর্থ্য কমছে, দেহেরও কমছে। শওকত যেন অনেকটা দিশেহারা হয়ে পড়েছে। সারাজীবন নানা রকম বিপদ আপদ নিয়ে চলেও তাকে কখনও মনমরা হতে হয়নি, কিন্তু আজ কাম্মুর চালচলন দেখে সে কেমন মনমরা হয়ে গেছে।

এই কাম্মু যখন মক্তবে পড়তে যেত সাড়ে চার পোয়া পথ হেঁটে, শওকত তখন ঘাটের নৌকা ঘাটে বেঁধে দিনের পর দিন ছেলের বই কেতাব নিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসত তাকে।

প্রথম যেদিন ক-খ পড়া শিখে স্লেটে আঁচড় কেটে লিখতে শিখল, সেদিন তার আনন্দের আর শেষ নেই। তার ছেলে তো আর জজ-ম্যাজিস্তর হবে না, বটতলায় মুহুরিগিরি করতে পারলেই তার যথেষ্ট। সেটুকু এলেমের ভরসায় সে দিন গুনেছে।

দিনই গুনেছে, কাম্মুও এগিয়ে চলেছে। কিন্তু জ্ঞানবুদ্ধি হবার সাথে কেমন যেন আগেকার কাম্মুকে সে হারিয়ে ফেলেছে। সে বুঝতেই পারেনি তার সেই কাম্মু আর কাম্মু নেই, সে হয়ে ওঠেছে পাকা মোছলমান।

ছিচরণের বাপ সেদিন শহর থেকে এসে বলল, "শওকত ভাই' তোমার কাম্মুকে দেখলুম ভেলেণ্টারি করছে।"

"ভেলেণ্টারি কি গো ?"

"তাও জান না, লম্বা চোগাচাপকান পরে রাস্তায় রাস্তায় কুচ্ করছে।"

শওকত কুচ্ কাকে বলে তাও জানে না। ছিচরণের বাবা তখন লাঠিখানা কাঁধে ফেলে মার্চ করে দেখিয়ে দিল কেমন করে কুচ্ করতে দেখেছে।

শওকত বুঝল ছেলে তার জঙ্গী হয়েছে। তা জঙ্গী হবার মতই তার চেহারা। অত কিছু না বুঝলেও শওকত মনে মনে ভয় পেল। শেষে মহারানীর ফৌজে গিয়ে নাম লিখিয়ে লড়াইতে যাবে না তো!

শনিবারে কাম্মু আসতেই জিজ্ঞেস করল, "তুমি নাকি কুচ্ করছ?"

কাম্মু হেসে বলল, "হাঁ, বা'জান। এদেশের মালিক ছিল মোছলমান, আবার মালিক হবে তারা। তাই আমরা শিখে রাখছি মালিক হলে দেশে কেমন করে ফৌজ রাখতে হয়।"

শওকত কাম্মুর কোন কথাই বুঝতে পারল না, তবুও বলল, "মালিকই যদি হবি তা হলে তোকে কুচ্ করতে হবে কেন!"

"ও তুমি বুঝবে না বা'জান। দেখছ না রাজা জমিদার সব হিন্দু, চাকরি করে হিন্দুতে, মোছলমানদের কিছু আছে কি? ক'জন হিন্দু মিলে মোছলমানদের পায়ের তলায় রাখবে, এ তো চলতে পারে না! তাই আমরা—"

"ও বুঝেছি, হিন্দু গোলামদের সহ্য হচ্ছে না, এবার তোরা গোলামি নিবি। তার জন্য কুচের দরকার হয় না, কেঁদে-কঁকিয়ে সায়েবদের পা ধরে পড়ে যা, তাতেই হবে। তোরা যেমন ওদের সহ্য করতে পারছিস না, তেমনি ওরা যদি সহ্য করতে না পারে তা হলে কি হবে! লড়াই-দাঙ্গা, মহারানীর লোকেরা দুতরফকে ঠেঙাবে এই তো?"

রাগ করে শওকত কাম্মুর সাথে ভাল করে কথা বলাই বন্ধ করে দিল।

চার

সন্ধ্যা হতেই সরকার-বাড়ির আঙিনায় ভীড় জমেছে। এ-পাড়া সে-পাড়া, এ-গ্রাম সে-গ্রাম, আশেপাশের মেয়ে-পুরুষ ভেঙে পড়েছে। শহর থেকে ডে-লাইট এসেছে। বারোহাটের নমোর দল এসেছে, ঋষির গাঁয়ের ঘোষেরা এসেছে, পালান মণ্ডল এসে উঠোনের পশ্চিম কোনায় দরমা বেঁধে কাপড় টাঙিয়ে পুতুল নাচের ঘর তৈরি করেছে।

আলো জ্বালবার সাথে সাথে সবাই উদগ্রীব হয়ে বসল কখন পুতুল নাচ আর কেত্তন আরম্ভ হবে। বড় কর্তা জানিয়ে গেল, আগে পুতুল নাচ হবে, তারপর কেত্তন।

পালানের সঙ্গীরা ঢোল করতাল নিয়ে সার দিয়ে বসল পুতুল নাচের ছাঁদনার সামনে। ডুম-ডুম-ডুম ঢোল বাজল ; ঝন-ঝনা-ঝন করতাল বাজল। শুরু হল পুতুল নাচ।

'গৌরহরি, গৌরহরি।' ঢোলে দমক দিয়ে গান ধরল পালানের দলের লোক।

পালান হাত-পা নেড়ে বলতে থাকে, "শ্রীহরি গৌরবিনোদের নাম নিয়ে শ্রীরামচন্দ্র আর সতী সীতার কাহিনী এবার আরম্ভ করব। আপনারা অনুমতি করুন। আজকের পালা 'মহীরাবণ বধ'।"

'মহীরাবণ বধ' নতুন পালা।

এতকাল সবাই রাবণ বধপালা শুনেছে, নতুন পালার কথা শুনে খুশী হল। পর্দার সামনে সুতোয় বাঁধা শোলার পুতুল নাচতে নাচতে এল।

ক'জনই বা পাতালের রাজা মহীরাবণের খোঁজ জানে। সেই অজ্ঞাত দেশের রাজা মহীরাবণ রাম-লক্ষ্মণকে চুরি করে নিয়ে গেল পাতালের অন্ধকার দেশে। সেখানে তাদের বলি দেওয়া হবে কালীর মন্দিরে।

তিড়িং তিড়িং করে লাফাতে লাফাতে কোথা থেকে হনুমান এসে হাজির। সবাই তো ভয়ে মরছিল, এই বুঝি রাম-লক্ষ্মণের শেষ, হনুমানকে আসতে দেখে সকলের ভরসা হল। বীর হনুমানই রামের আসল শক্তির উৎস। সে যখন এসেছে তখন নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

মহীরাবণ বধ শেষ হল। 'শ্রীহরি গৌরবিনোদ'-এর নাম নিয়ে পালান তার পালা শেষ করে ফেরি-ভিক্ষায় বের হল। পয়সা আধলা যা কিছু পাওয়া যায় সেইটেই তার উপরি লাভ।

পুতুল নাচ শেষ হতে না হতেই ছোট ছোট ছেলেরা ঘুমিয়ে পড়েছে। তখনও কেত্তন শুরু হয়নি।

বারোহাটের অমৃত খোল বাজায়। তার খোলের বোলে মানুষের মনের কথা ফুটে বের হয়। নামডাক আছে তার। সময় সময় শহরে গিয়েও খোল বাজিয়ে আসে। শহরে পাওয়া রূপোর মেডেল গলায় না ঝুলিয়ে সে কখনও বাজাতে বসে না।

রোগা-ঢ্যাঙা, চোখ দুটো গর্তে ঢুকে গেছে. আঙুলের মাথা থেকে ঘাড় অবধি হাতের শিরাগুলো ফুলে থাকে। তার হাতে খোল বাজে বলেই বারোহাটের নমোর দলের কেত্তন শুনতে দশ গাঁয়ের লোক জোটে। সেই অমৃতকে বড় কর্তা খুঁজে পাচ্ছিল না।

পুতুল নাচ শেষ হতেই নমোর দল প্রস্তুত হয়ে নিল। অমৃত এতক্ষণ বসে ছিল, কখন যে উঠে গেছে, কেউ জানে না। জানবে কি করে। ডে-লাইটের আলো ঝোপের পাশে আটক হয়ে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার সৃষ্টি করেছে। সেই আঁধারে মিলিয়ে গেলে কেউ কাউকেই খুঁজে পায়না ; অমৃত তো কালো কেষ্ট, তাকে খুঁজে বের করবে কে! নমোরা কিন্তু নিশ্চিন্তে বসে আছে। তারা জানে অমৃত কোথায় গেছে। বড় কর্তা জিজ্ঞেস করতেই নমোরা মাথা নেড়ে বলল, "এখুনি অমৃত আসবে কাকা।"

"রাত যে বেড়ে চলল। ছেলেরা সব ঘুমিয়ে পড়ছে।"

"দুপালা কেত্তন হবে, একটু রাত হবে বইকি। বিহান হতেও পারে।"

এর মধ্যেই অমৃত এসে গেছে। শুকনো নেশা না করলে তার হাত খোলে না। তাঁর প্যাঁকাটির মত আঙুলগুলো কিসের টানে ছুটবে, আছে কিছু! দেহে শক্তি নেই বলেই তো সে শুকনো নেশা করে। আজকের অভ্যাস নয়, যখন ছোট বেলায় জোয়ারীর আশ্রমে যেত তখনই গুরুর কাছ থেকে এ বিদ্যা শিখেছে। গুরু অবশ্য তাকে কোনদিন নেশা করতে বলেনি, শুধু কলকে ভরতে বলত। প্রথম প্রথম সে সেজেই দিত। ধীরে ধীরে দু'একটান দিতে শুরু করল। বেশ লাগে তো! গুরুকে প্রসাদ খাইয়ে খাইয়ে বেশ পোক্ত হয়ে গেল কিছুকালের মধ্যে। আশ্রম থেকে যখন ফিরে এল তখন সঙ্গে আনল দুটি বিদ্যা, একটি এই শুকনো নেশা, অপরটি খোলের বোল, আর আনল একটি অবিদ্যা, সেটি গুরুর পরিত্যক্ত একটি বৈষ্ণবী। লোকে অবিদ্যা বললেও সত্যি সে অবিদ্যা নয়।

বৈষ্ণবী বড় ভাল মেয়ে। তার গুণেই অমৃত বেঁচে আছে। অনেক চেষ্টা করেও সে শুকনোর হাত থেকে অমৃতকে বাঁচাতে পারেনি। কিন্তু তার গলার সাথে হাত মিলিয়ে খোল বাজাতে বাজাতেই অমৃত হয়েছে সেরা খোলবাদক।

অমৃত আসতেই 'গৌরহরি' বলে করতালে ঘা পড়ল। রুন্‌রুন্‌ করে করতালের শব্দের সাথে অমৃত খোলের বোল মিশিয়ে দিল।

শওকত একপাশে বসে পুতুল নাচ দেখছিল। কেত্তন শুরু হতেই সে এগিয়ে এসে বসল। ঘুমন্ত ছেলেরা আতকে কেঁদে উঠল। মায়েরা সন্ত্রস্থ হয়ে ছেলে সামলাতে থাকল।

কৃষ্ণ যাচ্ছেন দ্বারকায়।

সমাচার এসেছে রাধার কাছে। রাধা খবর পেয়েই ছুটে চললেন। কৃষ্ণের সাথে দেখা করতে।

মূল গায়েন বলল, "পথে দেখা কুটিলার সাথে।"

"কোথা যাও সখী?"

"আমার প্রাণনিধি দ্বারকায় যাচ্ছে। তার সাথে দেখা করে আসি।"

কুটিলা ভ্রূ কুঁচকে বলল, "লজ্জার মাথা খেয়ে এই দিনদুপুরে যাচ্ছিস। তোর কি ভয় ডর নেই।"

মূল গায়েন গাইল, "তোর কি ভয় ডর নেইরে ?"

দোহাররা সাথে সাথে সুর তুলল, "তোর কি ভয় ডর নেইরে। ওরে কালামুখী তোর কি ভয় ডর নেইরে ?"

"ভয়-ডর লজ্জা ! আমি কৃষ্ণের দাসী, ও তিনটে আমার থাকতে নেই।" শ্রীরাধা বিনিয়ে বিনিয়ে বললেন।

কুটিলা মুখ ঘুরিয়ে বলল, "যারা কালামুখী তাদের ওসব থাকেনা। তোরও নেই।"

মূল গায়েন আবার গাইল, "কালামুখীর মরণ ভাল।"

দোহাররা তার সাথে সুর জুড়ে দিল।

কেত্তন এগিয়ে চলেছে।

শওকতের ভাল লাগছিল না। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা যাবে, রাধা একা থাকবে। থাকবে বইকি। তার জন্য এত নাকে কাঁদা কেন বাপু। সে উঠে এসে বড় কর্তাকে ডেকে বলল, "এ কেত্তন বন্ধ কর কাকা।"

"বেশ তো হচ্ছে, তোর বুঝি ভাল লাগছেনা।"

"বিয়ের বউ নয়, প্রেমের সখি, তার কাঁদন ভাল লাগে না কাকা।"

বড় কর্তা হেসে বলল, "এই তো বিরহ। চিরকাল বউ নিয়ে ঘর করলি কিনা, তোর তো এসব জানা নেই। যেত যদি তোর বিবি ক'মাসের লেগে কোন ভিনগাঁয়ে তবেই বুঝতি।"

এ সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য শওকতের কোনদিন হয়নি। সে আবার উঠে এসে বসল। জোয়ান বয়সে কত রাত জেগে এই কেত্তন শুনতে দশপোয়া বারোপোয়া পথ হেঁটে সে ভিনগাঁয়ে গেছে। পরীর কাছে কম কথা শুনতে হয়নি তার। সেবার খবর পেল লক্ষ্মীকোলের হাটে কেত্তন হবে। রাতের খাওয়া শেষ করে পরীকে বলল, "একটু বাইরে যাচ্ছি পরী।"

"কোথায় যাবি রাতের বেলায় ?"

"লক্ষ্মীকোলের হাটে।"

"সে তো অনেক দূর, কেন যাবি ?"

"একটু পুঁথি শুনতে যাব।"

"তুই যাবি পুঁথি শুনতে, মিছে কথা। মানিকপীরের পুঁথি শুনতে যাবি তুই, একাঠামোতে যা হয়না তাই করবি। মিছে কথা।"

"হাঁরে-হাঁ, পুঁথি শুনতেই যাব, মানিকপীরের পুঁথি না হলে আর কোন পুঁথি বুঝি শোনা যায় না ?"

পরীকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বেরিয়ে পড়ল। জলকাদা ভেঙে লক্ষ্মীকোলের হাটে বসে সারারাত কেত্তন শুনে এল। সকাল বেলায় বাড়ি যখন ফিরল তখন তার গা গরম হয়েছে, ব্যথায় মাথা ছিঁড়ে পড়ছে, চোখ দুটো রাঙা জবা।

পরী তো কেঁদেই বাঁচে না।

"তোকে মানা করেছিলাম শুনলি না। কাঁচা-কচি ছেলে তাকেই সামলাব না তোকে সামলাব।"

শওকত কোন কথা না বলে ঢক্-ঢক্ করে এক বদনা জল খেয়ে কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল।

সেই থেকে দূরে কেত্তন শুনতে সে আর যায়নি। আশেপাশে কোথাও কেত্তন হলে শওকত ঘরে থাকতে পারে না। কেন যে কেত্তন শুনতে ভাল লাগে এ কথা সে নিজেও জানে না। খোলের ডগায় হাত পড়লেই শওকত আঁট সাঁট হয়ে বসে।

সেই বারোহাটের নমোদের দল কেত্তন গাইছিল আজও। বুড়োরা অতীতের কথা স্মরণ করেই বোধ হয় চোখ মুছছিল! জোয়ানরা আনন্দ পাচ্ছিল। আবার ভয় পাচ্ছিল নতুন গিন্নিদের সাথে তাদের না বিরহ হয় এই ভেবে। শিশুরা ঘুমিয়ে পড়েছে।

নিস্তব্ধ রাতের বুকে গানের মূর্ছনা আর খোলের শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল।

শ্রীকৃষ্ণ তখন রথে উঠে বসেছেন। মূল গায়েন আরম্ভ করল।

সারথি বল্গা ধরে জুতসই হয়ে বসেছে। এবার রথ ছুটবে। শ্রীরাধা দৌড়ে এসে ঘোড়ার বল্গা চেপে ধরে বললেন, "নাথ কোথা যাও ?"

মূল গায়েন তখন গান ধরেছে, "রাই, যেতে নাহি দেব।"

দোহাররা সুর তুলেছে, "কোথা যাও নাথ, যেতে নাহি দেব।"

"যেতে দেব না।"

"যেতে দেব না।"

তবুও রথ ছুটে বেরিয়ে গেল। শ্রীরাধা লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে, চোখের জলে বুকের আঁচল ভিজে গেল। ভেজা-আঁচলে রূপ তার ফেটে পড়তে থাকে।

"হরি হরি গৌর", বলে মূল গায়েন পালা শেষ করল।

সবাই বলল, "সাধু, সাধু।"

তারপর ঘোষেদের পালা। ওরা বিরহ গেয়েছে, এরা গাইবে রাসলীলা। শ্রীকৃষ্ণ বংশীবাদন করছেন। গোপ-গোপিনীরা নেচে নেচে গান করছে। কদম্ব কুসুমের মালা গেঁথে শ্রীরাধা এসেছেন শ্যামের গলার পরিয়ে দিতে।

মূল গায়েন ষোল সতেরো বছরের ছেলে। গৌরপানা মুখ, টানা টানা চোখ, দোহারা চেহারা, গলায় তুলসীর মালা, কপালে চন্দন, গায়ে নামাবলী।

শ্রীরাধা আসছেন, নিতম্বিনী গমন বিলম্বিনী। পায়ে নূপুর, রুনু রুনু তার ধ্বনি, হাতের কাঁকন বাজে ঝন্‌ঝনিয়ে; চলনে গমক, চলে গমগমিয়ে। রাধা এলেন তমাল তলে।

গায়েন সুর দিল, "নীল যমুনা···নীলপিয়াসী আমার রাই।"

দোহারেরা সুর ধরল, "সেথা কে যায়, কে যায়।"

শওকত দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে ঝিমিয়ে পড়েছে। তার কানে শুধু বুঝি ভেসে আসছে, 'নীল যমুনা'।

ঝিমুনির মাঝেই সে যেন দেখতে পেল, শ্রীরাধা তার গোপিনী নিয়ে যমুনার কূল আলো করে নেচে বেড়াচ্ছেন, শ্যাম তার বাঁশি নিয়ে তমাল তলে লুকোচুরি খেলছেন। গানের মূর্ছনা আর বাঁশির ধ্বনি আকাশবাতাস মাতিয়ে বৃন্দাবনের ঘরে ঘরে বসন্তের আগমন সংবাদ জানাচ্ছে।

শওকত ভুলে গেছে সবই, তন্দ্রার মাঝে তার কানে শ্যামের বাঁশি শুধু বেজে উঠছে, আর বাজছে সেই সুর, 'নীল যমুনা'।

'হরি হরি গৌর নিতাই'; শেষ হল পালা।

হৈ-হৈ করে শ্রোতারা উঠে দাঁড়াল। ভোগের বাতাসা লুট দেওয়া হল। শওকতের তন্দ্রা টুটে গেছে। সেও উঠে বাতাসা কুড়িয়ে নিল।

বড় কর্তা হেসে জিজ্ঞেস করল, "কেমন শুনলি শওকত।"

শওকত হেসে বলল, "খাসা। এমনটা শুনিনি কাকা।"

"যা দেখি, নতুন বৌমা তোকে ডাকছে। এদিকে তো বিহান হয়ে গেল। নেয়ে ধুয়ে খেয়ে দেয়ে যাস বুঝলি।"

"হাঁ কাকা।"

সরকার-বাড়ির সদর দরজায় কাঁকনমালা দাঁড়িয়ে ছিল। শওকত আসতেই বলল, "পাটনি-ছেলে তোমার জন্যই দাঁড়িয়ে আছি।"

"কেন কাকি?"

"ঐ যে ছেলেটা গান গাইল ওকে একবার ডেকে আনতে পার?"

"একশবার পারব।" শওকত ছুটে গেল তাকে আনতে।

ততক্ষণ তারা খোল করতাল নিয়ে রওনা হয়ে চলে গেছে। শওকত খুঁজে না পেয়ে এসে বলল, "ওরা তো চলে গেছে, একটু বেলা হলে ডেকে আনব। গানটা বড়ই মিঠে লেগেছে, না কাকি!"

নতুন কাকি হেসে বলল, "আরেক দিন ওর গান শুনতে হবে। ওদের ডেকে আনতেই হবে পাটনি-ছেলে।"

আজ ঘোষেদের জয় হয়েছে। বারোহাটের খোলের আওয়াজ জয় করতে পারেনি। নতুন কাকিরও এই রায়। শওকত খুশী হল। সেও ঐ বিরহ গান শুনতে ভালবাসে না। রাসের ঐ মধুমিলন সবাই ভালবাসে।

ভোরের আলোতে জোড়া কাক ডালে বসেছে, প্যাঁক প্যাঁক করে জোড়া হাঁস পুকুরে নামছে, সব জায়গাতেই জোড়া বাঁধার ধুম পড়ে

গেছে। হারানকর্তাও জোড়া বেঁধে এসেছে। এ জোড়-মিলনের দিনে বিরহ গান, ছ্যাঃ, ওসব তার ভালই লাগেনি।

শওকত নাইতে গেল পুকুরে।

ভোরের মন মাতানো বাতাসে সে নাইবার কথা ভুলেই গেছে। তখনও তার কানে ভেসে আসছে, 'নীল যমুনা'।

নীল যমুনার কূলে কালো তমালের ছায়ায় ননীচোরা শ্যাম বাঁশি বাজিয়ে চলেছে, সামনের পুকুরের জলে তারই বুঝি ছায়া পড়েছে। শওকত অপলকে সেই ছবি দেখে চলেছে।

ওরে আমার নীল যমুনা, সে কোথায়, কোন সায়রের তীরে, শওকত ভেবেই পায় না। অষ্টমের কাছেও এমনি প্রাণ মাতানো গান শুনে সেদিনও সে সোঁতার জলে গোকুলের ছবি দেখেছে। সে গোকুল কত দূর!

পাঁচ

সরকার-বাড়ির হৈ-হাঙ্গামা মিটে গেল, নতুন কাকিও ফিরে গেল হারানকর্তার সাথে বড় শহরে। যাবার সময় বলে গেল "পাটনি ছেলে, আবার যদি আসি তখন সবাই মিলে গাঁয়ে ইস্কুল বসাব ছেলেমেয়েদের, কেমন?"

শওকত মুক্তোর মত ঝক্‌ঝকে দাঁতগুলো বের করে পরিতুষ্টির হাসি হেসে বলল, "আবার আসবে তো কাকি?"

"আসব বই কি, কবে আসব তা বলতে পারি না। এবার ঘরে ঘরে ঘুরে দেখে গেলুম মানুষ কেমন করে জন্তু জানোয়ারের মত বেহাল হয়ে বাস করে, সেবার যদি আসি তা হলে চেষ্টা করব কি করে তাদের টেনে তোলা যায়।"

কাঁকনমালার কথা শওকত অতটা বুঝল না। মানুষ হতে আর কি উপাদান দরকার তা তার বোধগম্য নয়। সেও যেমন মানুষ তেমনি মানুষ গাঁয়ের সবাই, তাদের মানুষ করতে হবে কেমন করে তা সে বুঝতে পারে না।

শওকতের ফ্যাকাশে মুখের দিকে চেয়ে কাঁকনমালা বুঝতে পারল শওকত তার কথা বুঝতে পারে নি ; সে তার কথার জের টেনে বলল, "হাত-পা, চোখ-মুখ থাকলেই মানুষ হয় না, তাদের নিজের ভালমন্দ ভাবতে শেখাতে হবে, তারপর শেখাতে হবে কি করে মন্দকে ভাল করতে পারে, তার জন্য দরকার তাদের লেখাপড়া শেখা।"

"ওঃ!" বলে শওকত হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কাঁকনমালার কথা বুঝতে পেরে বলল, "হাঁ কাকি, এলেম দিতে হবে, এলেম না থাকলে মানুষ জাহান্নমে যায়। ঠিক বলেছ কাকি, এই দেখ না চোখ থাকতেও কেমন অন্ধ হয়ে আছি।"

তারপর আর কোন কথা হয়নি। ডিঙির লগি হাতে নিয়ে শওকত ভাবতে লাগল কবে আবার নতুন কাকি ফিরে আসবে, তাদের গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে পাঠশালায় আসবে।

কাঁকনমালা হারানকর্তার সাথে ফিরে চলে গেছে। তারপর পূজাপার্বণ এলে শওকতের চোখ দুটো খুঁজতে থাকে কাঁকনমালাকে। এবার ছুটিতে নিশ্চয় আসবে। কিন্তু ছুটির পর ছুটি পেরিয়ে যায় কাঁকনমালার পায়ের ধুলো আর ধলাটগাঁয়ের তল্লাটে পড়ে না। শওকতের আশাহত মনটা তবুও নতুন কাকিকে খুঁজে বেড়ায়।

বড় কাকিকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করত, "কবে আসবে নতুন কাকি?"

"আসবার তো কথা ছিল কিন্তু আসছে না কেন তা তো বুঝি না। শহুরে মেয়ের গাঁয়ের এঁদো বিল খাল ভাল লাগে নি। তাই বুঝি আসছে না।"

কথা অসমাপ্ত রেখে বড় কাকি নিজের কাজে হাত দিত। শওকত সব কথা শুনতে পায় না, বড় কাকি শওকতের মনের কথা বোঝে বলেই আঘাত দিতে চায় না। কাঁকনমালার আসাটা তার ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে হারানকর্তার ইচ্ছার ওপর।

সেদিন শুনল হারানকর্তা নতুন কাকিকে নিয়ে কোথায় অনেক দূরে গেছে। সে নাকি অনেক দূর। রেলের টিকিট লাগে পাঁচ গণ্ডা টাকা। তিন তিনটে রাতদিন কেটে যায় রাস্তায়। শওকত অনুমান করতে চাইল সে জায়গাটা কতদূর। নদীর ভাটিতে তিন দিনের পথ, উজানে সাতদিন। কি জানি কি হবে। শওকত অত ভাবতেও পারে না।

দেখতে দেখতে পাঁচটা বছর কেটে গেছে। মুক্তোর মত ঝক্‌ঝকে পাথরের মত শক্ত দাঁতের গোড়া আজকাল কন্‌কন করে। চুপি চুপি আড়াইকুড়ি বছর পেরিয়ে গেছে, শেষ বয়সের ডাক এসে গেছে। অনেক দিনের পুরানো সব কথা ভুলেই গেছে সে। পঞ্চায়েতের পাঠশালে দল বেঁধে যখন ছেলেমেয়েরা পড়তে যায় তখন মাঝে মাঝে মনে পড়ে নতুন কাকির কথা। আবার ঝিমিয়ে পড়ে স্মৃতি। শওকত হাঁসফাঁস বোধ করে। এখন সে ভাল করেই বুঝেছে, নতুন কাকি আর আসবে না, তার এই বুড়ো ছেলেটাকে সে ভুলেই গেছে।

যশাইয়ের ঘাটে লগি পুঁতে আগুনের মালশায় ফুঁ দিয়ে ঘুঁটে ধরায় তামাক খাবার আশায়।

নিদেন পাঁচটা বছর। এর মাঝে কত ঘটনা ঘটে গেছে। সবচেয়ে তাজ্জব ব্যাপার ঘটল জোলা পাড়ার মসজিদে। সাদা বড় বড় কাগজে লাল বড় বড় হরফে কি যেন লেখা, সেগুলো গাঁয়ে গাঁয়ে সজনে আঠায় চপকে দিয়ে গেল শহুরে মিঞা ভাইরা। কদিন থেকে বদন চৌকিদার প্রেসিডেন্টের বাড়িতে সকাল বিকাল দৌড় ঝাঁপ করছে, কি যেন একটা হবে। সবার চোখে মুখে জানাবার ইচ্ছা ফুটে উঠেছে। নতুন কিছু ঘটবার আশায় রয়েছে সবাই।

পারঘাটায় বদন এসেছিল। বিনি পয়সায় চাট্টি মাছ খুঁজতে। শওকত জিজ্ঞেস করল, "এত লাল নীল কাগজ কিসের রে বদন?"

"জাননা বুঝি চাচা। মোনতিরি আসবে গো, মোনতিরি। জোলাপাড়ায় মিটিং হবে।"

"মিটিং!"

"হ, মজলিশ, মোনতিরি আসবে, ওয়াজ করবে, আর বক্‌তিঙ্গা দেবে।"

"তাই বুঝি তুই ছোটছুটি করছিস।"

"হ, মহারানীর রাজ্যে লাট মোনতিরি আসলে আমাদের কি আর দম ফেলবার সময় থাকে। জান-মাল কবুল করতে হয়।"

"বুঝলাম, নে একটু তামাক সেবা কর," বলে শওকত মাথা নাড়তে লাগল।

হুঁকোর মাথা থেকে কল্কে তুলে বদনের হাতে দিল। বদন হাতের চেটোয় কল্কেটা বাগিয়ে ধরে ছ'এক টান দিয়েই বলল, "আর দেরী করতে পারব না চাচা, কখন ডাক আসে তার ঠিক কি।"

মাথার ফেটি-বাঁধা কাপড়খানা বিছিয়ে ধরে বলল, "আছে কিছু ?"

একমুঠো পুঁটিমাছ খোলুই থেকে বের করতে করতে বলল, "তোদের মোনতিরি বুঝি খেতে দেয় না!"

বদন একটু লজ্জিত হয়ে বলল, "খাই তো সরকারের, কিন্তু পাঁচটা ট্যাকায় কি করে ছ'জনের পেট কুলান হয়, তাই চেয়ে মেগে খেতে হয়। এই দেখনা, লড়াই আর আকালে কি দুর্দশাই গেল সবার।"

শওকত হাসল, বলল, "জান-মাল কবুল করতে হয়, কি বলিস ?"

বদন আর উত্তর খুঁজে পেল না।

শওকত বলল, "তার চেয়ে জেলের ছেলে জাল মেরে খা, পেট ভরবে, নগদ কড়িও পাবি। উর্দি-পটি ফেরত দিয়ে দে, ইজ্জত থাকবে।"

বদন যে একথা কখনও ভাবেনি তা নয়, কিন্তু চৌকিদারের ইজ্জত আর জেলের ইজ্জত এক নয় তো, তাই সে করব করব মনে ভেবেও কিছু করতে পারেনি।

মন্ত্রী এল। সোর-গোল, সাজ-গোজ কোন কিছুরই অভাব হল না। দশবিশখানা গাঁ ভেঙে লোক উঠল জেলাপাড়ার ডাঙায়। শওকতের কোন হুঁস নেই সে সব বিষয়ে, নিজের ভাবনায় নিজেই মশগুল।

পিরজিপাড়ার কেরেস্তানরা দল বেঁধে চলেছে, বারোহাটের নমোরা দল বেঁধে চলেছে, সাতগাঁয়ের মুসলমানরা মিছিল করে চলেছে, শওকতের পারঘাটায়। ভীড় আর কমে না, কিন্তু শওকতের ভ্রূক্ষেপও নেই। ক'দিন থেকে কাম্মুরও টিকি দেখা যায়নি। সেই বুধবার বিহানে বাড়ি এসে পান্তা খেয়ে সবুজ টুপি মাথায় দিয়ে বেরিয়েছে, আজও ফেরেনি। সে এখন নাকি ভেলেণ্টারি করছে।

বিকেল বেলায় সরকার-বাড়িতে শুনে এসেছে সরকার-কর্তারাও নাকি যাবে দুপুরের মজলিশে। তাদের কাছেই তা হলে সব শোনা যাবে। নিজে গিয়ে আর কি করবে! দুপুর নাগাত ঘোষেদের অমূল্য এল পারঘাটায়। দুধের জোগান দেয় শহরে, অনেক খবর সে রাখে। শওকতকে দেখে বলল, "বড়মিঞা তুমি যে গেলে না!"

"কোথায়?"

"মিটিং শুনতে। মন্ত্রী এসেছে, হাকিম-হুকুম এসেছে। তুমি যাবে না? বাবা! মানুষে মানুষে গাদাগাদি।"

"কি হবে গিয়ে, তার চেয়ে দু'খেপ লোক পার করলে কিছু নগদ কড়ি আসবে। রোজ তো আর মোনতিরি আসবে না, পারঘাটায় এত ভীড়ও হবে না।"

কড়ির আশায় শওকত বেপারি পারের খেপ দেয় না। আসল কথা লোকজন দেখলে সে কেমন ঘাবড়ে যায়। আগের দিন আর তার নেই। সব সময়ই তার মনে হয় গ্রামের সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনের কোথায় যেন ফাটল ধরেছে। মনে হয় গ্রামের চেয়ে ব্যক্তির স্বার্থ বড় হয়ে দেখা দিয়েছে, তাই অজ্ঞাত আশঙ্কায় মাঝে মাঝেই সে শিউরে ওঠে; মনের কথা বলবার মত লোক সে খুঁজে পায় না। অনেক সময় পরীকে দু'একটা কথা বলতে গিয়ে আধপথে থামতে বাধ্য হয়েছে। পুরানো দিনের স্মৃতি নতুন দিনের ধাক্কায় লজ্জাবতী লতার মত জড়োসড়ো হয়ে গেছে। অমূল্যের কথায় শওকতের মনে কোন উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারল না ঠিকই কিন্তু মানুষের জানবার শাশ্বত

ইচ্ছা তাকে অজানার দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে লাগল। তবুও সে চুপ করে রইল।

"কড়ি যা কামিয়েছ বড় মিঞা তাতেই তোমার জীবন কেটে যাবে, এ বেলায় জসিমকে ডিঙি দিয়ে বেশ যেতে পার তুমি। তুমি গেলে তোমার সাথে আমিও যাব।"

শওকত হাসল। তা তো বটেই, সেবার পালাজ্বরে দশগণ্ডা দিন পারঘাটায় আসতে পারেনি, তাতেও তার খাবারের অভাব হয়নি কখনও।

"চল বড়মিঞা।" অমূল্য তাগাদা দিল।

"তুই কি বলিস।"

"চল না দেখেই আসি।"

অনেক ইতস্ততঃ করে মাঠ থেকে জসিমকে ডাকিয়ে পারঘাটায় বসিয়ে শওকত রওনা হল।

মন্ত্রী এল, বক্তিঙ্গা দিল, কত কি হল। শওকত এসবের এক বর্ণও বুঝল না। শুধু সাজগোজ, হৈ-হাঙ্গামাই দেখল।

অমূল্যকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, "মোনতিরি কি বলল রে অমূল্য ?"

"আমিও বুঝিনি বড়মিঞা। আমাদের খোট্টা বেহারাগুলো বোধ হয় বুঝতে পেরেছে, দাঁড়াও ওদের কাছ থেকে শুনে আসি।"

তা হলে পশ্চিমা খোট্টাই ভাষায় বক্তিঙ্গা হল, তাই সে বুঝতে পারেনি। বাংলা দেশের মোনতিরি বাংলা জবানে বক্তিঙ্গা না দিয়ে খোট্টাই জবান ঝাড়ল, গাঁয়ের চাষা বুঝবে কি করে!

অমূল্য ঘুরে এসে বলল, "খোট্টারা আসেনি, তবে ভেলেণ্টাররা বলছিল, খাসা বলেছে মন্ত্রী, খাসা তার নজর।"

তারা হয়তো বুঝেছে।

সবাই যা বোঝে না সে কাজ মোনতিরি কেন করে, শওকত ভেবেই পেল না দেশের লোক দেশের মন্ত্রীর সওয়াল কেন বুঝতে পারবে না।

দশা মণ্ডল যাচ্ছিল, তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করল।

দশাও বোঝেনি, তবে শুনে এসেছে আসল খানদানী মোছলমান যারা, তারা কাফেরী জবানে বাতচিত্ করে না, তারা খাস মোছলমানী জবানে বাতচিত্ করে।

এতক্ষণে শওকত কিছুটা বুঝল। তা হলে শওকত, জসিম, দশা, হুরমত এরা কেউ খানদানী নয়, শুধু মোছলমান। এবার সে বুঝল কেন তার ছেলে নাম পাল্টেছে, কেনই বা রহিম তর্কবাগীশ না-পাক পানির হিসাব দিচ্ছিল। এতদিনে সে বুঝল মোছলমানেরও জাত রয়েছে।

পথে বদনের সাথে দেখা। শওকতকে দেখে একগাল হেসে বলল, "শুনলে তো বড় মিঞা এবার চৌকিদারদের দর্মা বাড়বে, পাঁচ ট্যাকা আর থাকবে না, এবার থেকে লয় ট্যাকা হবে। আর গাঁয়ে গাঁয়ে ইস্কুল আর টিউকল হবে।"

শওকতও খুশী হল। খোশ খবর ঝুট হলেও শুনতে ভাল।

রাস্তাঘাটে সর্বত্রই এক কথা। মন্ত্রী আর মন্ত্রী। সবাই ভবিষ্যতের আশা নিয়ে সরকারী দয়া পাবার দিন গুণতে থাকে। তারপর ঢিমিয়ে আসে উত্তেজনা; সময় হাঁটে, মনের কোনে প্রলেপ পড়ে। কোথায় পাঠশালা, কোথায় মক্তব, কোথায় ইঁদারা, আর কোথায় টিউবওয়েল! বছর পেরিয়ে গেল অথচ মন্ত্রীর কথামত কিছুই পেল না গাঁয়ের আশাতুর লোকের দল। লোকে তো ভুলেই গেছে। কিন্তু বদন ভুলতে পারেনি। সবচেয়ে মনমরা হল বদন চৌকিদার। 'লয়-ট্যাকা' দর্মা তার আর হল না। একদিন তো প্রেসিডেন্টের সাথে মুখোমুখি হয়ে গেল।

বদন অতশত বোঝে না। সে বলল, "মোনতিরি বলেছে পঞ্চায়েত দেবে টাকা, তোমাকে বললে জবাব দিচ্ছ, 'আমি জানি না' আসলে তোমরা দেবে না, তাই বল। গরীব মেরে আসান হবে না পিসিডেন।"

প্রেসিডেন্ট রেগে-মেগে বলে উঠল, "তোর মোনতিরির বাপের জমিদারী আছে এখানে? ট্যাক্স আদায় করে মাইনে মেটাতে হয় তা বুঝি জানিস না? ক' টাকা আদায় হয় জানিস কিছু। যা আদায়

হয় তা দিয়ে চৌকিদারের দর্মাই কুলায় না, দেশের লোক হর-সালে কলেরায় মরছে, একটা চাপা কল করতে পারি না। যা তোর মোনতিরির কাছে, সে-ই তোকে দেবে।”

বদন আর ‘রা’ করে না। তা হলে সবই মিথ্যে!

পারঘাটে এসে শওকতকে বলল, “তোমার কথাই ঠিক চাচা। এবার থেকে জাল মেরেই খাব।”

“কেন রে?” শওকত কৌতুক অনুভব করে জিজ্ঞেস করল।

“মোনতিরি বলল ‘লয় ট্যাকা’ দর্মা দেবে। বলতে গেলুম তো পিসিডেন তেড়ে মারতে এল। অমন গোলামির মুখে আগুন। রাত নেই বিরেত নেই ‘জাগো, জাগো’ হাঁক ছাড় আর বউ ছেলে নিয়ে না খেয়ে থাক। সেবার অজন্মার বছরে তিন বিঘে জমি গিয়ে ঢুকল ন্যাদা-তেলির গব্বে। এখন শুকিয়ে মর।”

“কবার হল?” শওকত হেসে জিজ্ঞেস করল।

“কিসের কবার?”

“এই গোলামি ছাড়ার পিরতিগ্যে।’

বদন খিঁচিয়ে উঠল। অন্য কেউ হলে তার সরকারী মেজাজ না দেখিয়ে ছাড়ত না, কিন্তু শওকত বেপারিকে তার বড় ভয়, মান্যিও করে, নেহাৎ অনুযোগের সুরে বলল, “মনে করলেই তো কাজ হয় না চাচা। মহারানীর চাকরি করব না বললেই তো হয় না, চাকরি ছাড়লে জেল হবে সে কথা ভাল করেই তো জান। মহারানীর চাকরি ছাড়ি কি করে।”

‘তাই বল, তুইও তো ছোট সরকার; তুই বা কিসে কম! মোনতিরি এসে তোর পিঠ চাপড়ে দিল একি কম ভাগ্যি।”

হ্-হ্ করে বদন হাসল। বোকার হাসি। শওকত বেশ উপভোগ করছিল। বদনের হাসির রেশ তখনও শেষ হয়নি, শওকত বাধা দিয়ে বলল, “এবার কি করবি বল?”

“ভেবে এসে বলব চাচা।”

"হাঁ তাই ভাল, বাড়িতে গিয়ে গিন্নীকে শুধিয়ে আয় এমন ইজ্জতের গোলামি ছাড়বি কি না। আজ না ছাড়লেও একদিন ছাড়বি, সেদিন কেঁদে কুল পাবি নে।"

বদন শওকতের হুঁকো থেকে আবার কল্কেটা নামিয়ে হাতের চেটোয় জুতসই করে বসিয়ে নিল।

শওকত এসব ঘটনা মোটেই ভোলেনি। কত রাজা-উজির পেরিয়ে গেল তার জীবনে, সে যেমন পাটনি ছিল তেমনি রয়েছে, বদল হয়নি কোথাও। আজও আগের মত সরকার-বাড়ির ফাই-ফরমাস খাটে, সরকার-বাড়িকে ভাবতে হলে শওকতকে কেউ বাদ দিয়ে ভাবতে পারে না। সরকার-বাড়ির নিমকে নিজেকে বেঁধে জিন্দেগি গুজার করে এনেছে প্রায়।

এতগুলো বছর তো একটা ঘটনা নিয়ে পাড়ি জমায়নি, আরও কত ঘটনা ঘটে গেছে, সব কিছুই শওকতের জ্ঞান মত ঘটেছে। শওকত সে সব কথা একটিও ভোলেনি।

হঠাৎ সেদিন পুরন্দরকে দেখে পুরানো অনেক কথাই মনে হল। আকালের বছর, লোকে না খেয়ে মরছে দিকে দিকে। সেই বছরেই পুরন্দরের সাথে প্রথম দেখা।

পুরন্দর বিশার বামুন ঘরের ছেলে। খাস আল্লার এজেন্ট। পূজাআর্চা করে যজমান ঠেঙিয়ে দিন তার মন্দ কাটছিল না। কিন্তু আকালের বছরে অন্য সবার মত তারও দিন চলাই ভার। চালকলার পোঁটলার পেট শুকিয়ে ছোট হতে লাগল। দেশের মানুষের মতই পোঁটলার বরাদ্দ কমে যাওয়াতে শেষ পর্যন্ত পুরন্দরকে তিনজন পোষ্য নিয়ে মহা ভাবনায় পড়তে হল। ছোট ভাই-বোন আর বিধবা মা, সবদিন দুবেলা আহার জোটে না। বামুনের বিধবার মত একবেলা হবিষ্যান্ন করতে হয় প্রায়ই। শেষে তাতেও টান ধরল।

সেদিন সোঁতার ঘাটে সাঁঝের আবছা আঁধারে শওকত বসে আছে পারানির আশায়। কার্তিকের খোলা আকাশে সবে একফালি চাঁদ উঠেছে। রূপালি জলের বুকে চাঁদের আলো হেলে দুলে বাতাসের সাথে নেচে বেড়াচ্ছে। শওকত বোধ হয় অন্যমনা হয়ে সেই রূপের নর্তন উপভোগ করছিল, এমন সময় দু'জন সোয়ারি এসে উঠল ডিঙিতে।

"কোথায় যাবে গো?" অভ্যস্থ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল শওকত পাটনি।

"রামেশ্বরপুর।" উত্তর দিল পুরুষ সোয়ারি। চাঁদের আলোতে সে দেখতে পেল বেশ নাদুসনুদুস প্রায় তিরিশ বছর বয়সের কালো কুচকুচে টেরিবাগান শহুরে কাপ্তানবাবু, সাথে চাঁদপানা মুখ নিয়ে বসে রয়েছে একটা যোল সতেরো বছরের মেয়ে। শওকত কাউকেই চেনে না, দশখানা গাঁয়ে তার অচেনা পুরুষ কেউ তো নেই। ভাবভঙ্গীতে নতুন জামাইও মনে হল না।

"কোথা থেকে আসছ তোমরা?"

"বিশা থেকে," পুরুষ সোয়ারি উত্তর দিল।

"কাদের ঘরের?"

"পুরন্দর ঠাকুরের।"

শওকত জানত পুরন্দরের অবস্থা, সন্দেহ হল। জিজ্ঞেস করল, "গিয়েছিলে কেন?"

সোয়ারির ধৈর্য বোধ হয় ভেঙে পড়ল। সে দাঁত খিঁচিয়ে বলল, "তাতে তোমার কি দরকার।"

"চটো কেন মশাই। সরকারের ইজারদার সরকারেরই লোক, অনেক খবর রাখতে হয়। জবাব না দিলে গাঙ-পার যেতে পারবে না মশাই।"

সোয়ারি বোধ হয় বিপদ গনল। সে বলল, "গিয়েছিলুম সওদা করতে।"

শওকত হেসে বলল, "মেয়েলোকের সওদা, নাটুরার হাটে বড়ই দাম, বেশ চড়া দামেই বিকোবে। আকালের বছর, দুবেলা পেটপুরে খেতে পায়না, তাই সওদা করলে, নয় কি ? কত দাম দিলে মশাই ? পয়সা দিয়ে মেয়ে কেনা যায়, এ ব্যবসার মূলধন কম, আমদানী বেশী কিন্তু ব্যবসার সুদও দিতে হয় বেশী। বুঝলে !"

পুরুষ সঙ্গী ভয় পেলেও মুখের তম্বী ছাড়েনি, সে জোর গলায় বলল, "ডিঙি ছাড়বে কি না ?"

"নিশ্চয় ছাড়ব, কিন্তু তোমায় ছাড়ব না। নোলায় জল ভর্তি হয়েছে বুঝি। তোমার মা-বোন নেই ?"

পকেট থেকে দশ টাকার নোট বের করে শওকতের সামনে রেখে বলল, "নাও, এবার ডিঙি ছাড়।"

"তোবা, তোবা। পয়সা নিয়ে মেয়েদের ইজ্জত বেচা যায় না মশাই। ও টাকা ওঠাও, ও হারাম ওঠাও। তুমি বল দিকি মা, তোমার সাথে ও-লোকটি কে ? এ রাস্তায় ওকে তো কখনও দেখিনি। বাইশ গাঁয়ের লোক চিনি আমি।'

মেয়েটা উত্তর না দিয়ে ফুঁপিয়ে উঠল।

গর্জে উঠল শওকত পাটনি, "গাঁয়ের মেয়ে ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছ, দেখছ বৈঠা, মাথা দু' ফাঁক করে দেব। শওকত পাটনির ভয়ে বাগ্দী পাড়ার নোটন-ডাকাত ডাকাতি ছেড়ে চাষী হয়েছে, জান ? উঠে এস।"

হাত ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে শহুরে কাপ্তানকে ডিঙি থেকে ফেলে দিল সোঁতার জলে। কার্তিকের ভরা সোঁতার ঠাণ্ডা জলে সদ্য কাটা কৈ-মাছের মত কাপ্তান বাবু হাত-পা ছুড়তে ছুড়তে ওপারের ডাঙায় উঠে ঝোপের আড়ালে মিলিয়ে গেল।

পলায়মান কাপ্তানবাবুর দিকে চেয়ে বহু দুঃখের মাঝেও শওকতের মুখে ঘৃণার হাসি ফুটে উঠল।

শওকত ভুল করে নি। সত্যিই আকালের দিনে পেটের দায়ে পুরন্দর নিজের বোনটাকে আট কুড়ি টাকায় বেচে দিয়েছিল। বোনকে ফিরিয়ে দিয়ে শওকত তাকে বলে এল, "যতদিন খাবার না

জুটবে আমার কাছে এস। ধান দেব তাই দিয়ে কষ্টেসিষ্টে চালিয়ে নিও।”

পুরন্দর হাত জোড় করে দাঁড়াল। “একথা কাউকে বল না মিঞা-সাহেব, অনেক লজ্জা পেয়েছি। নইলে গলায় দড়ি দিয়ে মরতে হবে।”

শওকত তার পিঠে হাত বুলিয়ে শুধু হাসল।

তারপর কতদিন চলে গেছে। শওকতের দেওয়া ধানের দৌলতে পুরন্দর ইজ্জত নিয়ে বেঁচে গেছে। গাঁয়ের মেয়ে যাবে হাটে পেশা করতে তা শওকত সইতে পারে না। তাই নিজের খাবার তাদের মুখে তুলে দিয়ে কষ্ট সইতে কসুর করেনি।

সেদিন পুরন্দর এসেছিল দাওয়াত দিতে। সেই বোনের বিয়ে। গরীব-গোবরা যাই হোক খেয়ে পড়ে সংসার করতে পারবে। আতাইকুলার চক্কোত্তি বাড়িতে বিয়ে! দুটো খেয়ে বাঁচবে, তার বেশী কিই বা তারা চায়।

পুরন্দরকে দেখতে পেয়ে তার সেই ফেলে-আসা দিনের কথা মনে পড়ল।

“যাব ভাই, নিশ্চয়ই যাব। তোমার বোনের বিয়ে, আমি না গিয়ে পারি।”

“তুমি না গেলে বোনের বিয়ে বন্ধ রইবে ভাই।” বলেই পুরন্দর লজ্জায় লাল হয়ে উঠল।

পুরন্দর বেইমান নয়, সে বাঁচতে চেয়েছিল সেদিন, অস্থাবর সব কিছু বিকিয়ে শেষ সম্বল জ্যান্ত মানুষকে বিকিয়ে দিয়ে বাঁচতে চেয়েছিল। একটাকে বধ করে বাকি কটা বাঁচান তার পক্ষে স্বাভাবিক। আদ্যিকাল থেকে খাবারের আশায় মানুষ অন্যকে বঞ্চনা করেছে, নিজেকে বঞ্চিত হতে দিতে চায়নি। সামনে তাকিয়েছে, পেছনে তাকাবার অবসর পায়নি। এ অপরাধ নয়, বৃত্তিগত বাস্তব নেশা মাত্র। তাই অপরাধ তার হয়নি, অনাচার ঘটেছিল কিছু। আকালের ঋণ শোধ দিতে এসেছে শওকতকে নেমতন্ন করে।

শওকতের দু'হাত জড়িয়ে ধরে পুরন্দর বলল, "সেদিন আমার ইজ্জত রেখেছ, এবারও আমার ইজ্জত রেখ কেমন?"

শওকত হেসে শুধু মাথা নাড়ল। এমন দরদভরা কাকুতিকে অপমান করতে সে পারেনি। পরীকে সাথে নিয়েই হাজির হল পুরন্দরের ঘরে।

খবর পেয়ে আশালতা ছুটে এল। পরীর হাত ধরে সে কিছু বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলল।

পরী জানে সবই, শওকতকে নিয়ে তার বড়ই গরব। সে গরব পূরণ হল আশালতার চোখের জলে বুক ভিজিয়ে।

আনন্দের আতিশয্যে পরীর গাল বেয়ে টস্ টস্ করে জল পড়তে থাকে।

ছয়

এবার আর হেঁইও-হেঁইও করে পাল্কি বয়ে আনতে হয় নি, ছয় পোয়া পথ পায়ে হেঁটে এসেছে নতুন কাকি। এত বছর পর নতুন কাকি আসবে সে কথা শওকতও কল্পনা করেনি। চোখের জোর কমে গেছে, প্রথমে চিনতেই পারেনি। মেয়েছেলে জুতো পায়ে গট্-গট্ করে হেঁটে পারঘাটায় আসছে দেখে শওকত ঘাবড়ে গেল। পেছন পেছন বাক্স মাথায় নিয়ে যে লোকটা আসছিল সে ঘেমে নেয়ে উঠেছে।

শওকত যেমন সবাইকে জিজ্ঞেস করে তেমনি জিজ্ঞেস করল, "কোথায় যাবে গো তোমরা?"

তার সামনে এসে কাঁকনমালা থমকে দাঁড়াল, মাথার ঘোমটাটা একটু সরিয়ে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল, 'চিনতে পারলে না পাটনি-ছেলে!"

শওকত অনেকক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, "চেহারা মালুম হচ্ছে না, কিন্তু মিঠে গলার শব্দে মনে হচ্ছে তুমি আমার নতুন কাকি।"

"ঠিক ধরেছ।" খুশিতে কাঁকনমালার মুখ রাঙিয়ে গেল।

শওকত আনন্দে ফেটে পড়তে লাগল। হাত দুটো জোড় করে বলল, "এই বুঝি তোমার শীগ্‌গির আসা। মা হয়ে বুড়ো ছাওয়ালকে ভুলে ছিলে কি করে বলত কাকি ?"

পেছনের মোটবাহী ততক্ষণ বাক্স নাবিয়ে বিড়ে করা গামছা খুলে পাখার মত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাতাস খেতে শুরু করেছে।

"বড়ই তাত্, উঠে ছইয়ের তলায় বস কাকি।"

"আর বসব না পাটনি-ছেলে, বাড়ি যাচ্ছি, সেখানে এস কিন্তু।"

"হারানকর্তাকে দেখছি না যে বড় !"

"তার তো ছুটি নেই, এতগুলো বছরে ছুটি করতে পারল না বলেই তো একা আসতে হল।"

"কর্তাকে খবর না দিয়েই এসেছ !"

"সময় পেলুম কৈ, শুধু বড়-ঠাকুরকে 'তার' করেছিলাম, তিনি স্টেশন থেকে নিয়ে এসেছেন। আসছেন পিছু পিছু। এবার চলি, কেমন ?"

শওকত মাথা নাড়ল, তার বুকের ভাষা মুখে ফুটে উঠল না। পরিতৃপ্তির হাসিতে মুখ ভরে উঠল।

নতুন কাকি এসেছে। গাঁয়ে সোরগোল পড়ে গেছে। সেই সেবার এসেছিল, আর আসেনি, তাই তাকে দেখতে সরকার-বাড়ির আঙিনায় ছোট বড় সবাই ভীড় করেছে।

চন্দরের হাতে নৌকা ছেড়ে দিয়ে শওকত বেরিয়ে পড়ল সরকার-বাড়ির পথে।

সরু রাস্তায় যশাইয়ের ঝোপ ছাড়তেই বড় কর্তার সাথে মুখোমুখি দেখা।

"হারুর বউ এসেছে শওকত।"

হেসে শওকত জবাব দিল, "আমার সাথে মোলাকাত হয়েছে কাকা। তোমাদের উঠোনেই যাচ্ছি।"

"চল চল। আচ্ছা মেয়ে বাপু, একটা চিঠি-পত্তর কিছু না, আজ সকালে 'তার' পেলুম, আমি দশটার গাড়িতে পৌঁছাচ্ছি। পড়ি মরি

করে ছুটলাম স্টেশনে। শুনছিস তো আজকালকার হাল চাল। কলকাতায় নাকি কাটাকাটি চলছে। এই হাঙ্গামার দিনে কেউ আসে নাকি রে বাপু। বল দেখি, গাঁ-দেশে এত অল্প নোটিসে মানুষ কিছু করতে পারে কখনও।”

নতুন কাকি এসেছে এতেই খুশী হয়েছে শওকত, তার বেশী সে শুনতে চায় না।

তাজ্জব ব্যাপার। মেয়েছেলে চারদিনের পথ একাই এসেছে। একেই বলে লেখাপড়া শেখার কদর। চাকরি করছে, ভাত রাঁধছে, আবার দুনিয়া ঠেঙিয়ে বেড়াচ্ছে।

ভ্রাতৃবধূর মহিমা বর্ণনায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল বড় কর্তা। শওকত নীরব শ্রোতা, পেছন পেছন যেমন চলছিল তেমনিই চলতে লাগল।

“এদিকে তোদের খবর কি?”

“পিরজিপাড়ায় চড়কে বড়ই জোলুস গেছে এবার। পেটা সাঁওতাল পিঠ ফুঁড়িয়ে বন্ বন্ করে পাক খেতে খেতে মুখে রক্ত উঠে মরে আর কি। হাতেম মিঞার পিঠের ফোঁড় এখনও শুকোয় নি, পিঠ ফুলে ঢোল হয়েছে। নিধু বাগ্দী শলায় শুয়ে শিব হয়ে বোম্ বোম্ করছিল।”

“তা হলে জোলুস হল কিসে?”

“এবার কেষ্ট যাত্রা এসেছিল কাকা। বছর বছর কেত্তন শুনতে শুনতে লোক হয়রান হয়ে গেছে, এবার তিন রাত্তির যাত্রা হয়েছে। নদের দল, বেশ গেয়েছে কাকা। তবে যাই বল, আমাদের কেত্তনের চেয়ে মোটেই ভাল নয়। একই গান, একই সুর, শুধু ছোঁড়ারা কেষ্ট-রাধা সেজে নেচে নেচে গান শোনাল। লোকের কথা আর বল না কাকা, মানুষ যেন পাগল হয়ে উঠল। সেখান থেকেই লক্ষ্মীকোলের হাটে তিন পালা বায়না নিয়ে গেল।”

“তা হলে চাষার ঘরে টাকা আছে, কেমন?”

“পেটের ভাত জোটাতে ট্যাকায় টান পড়ে, হুজুগে মাতলে ট্যাকার অভাব হয় না কোন দিনই। চাষার বুদ্ধি, তিরিশ ট্যাকার পাট পাইকেরকে দেয় আঠার ট্যাকায়, বোঝ বুদ্ধি!”

বড় কর্তা সব কথা খেয়াল করেনি, তার মাথায় ঘুরছে কেষ্ট যাত্রার কথা। জিজ্ঞেস করল, "হাঁরে, ওরা চলে গেছে নাকি?"

"কারা কাকা?"

"ঐ কেষ্ট যাত্রার দল। নতুন বউমা এসেছে, দু' একপালা লাগিয়ে দিলে মন্দ হত না, কেমন! যাবি ওদের খোঁজে।"

"তুমি বললে যাব বইকি। কিন্তু বেয়া লাগবে কাকা। ওদের গলায় সুরও নেই, হাতেও বোল নেই। নাকি-নাকি সুরে 'সখিগো' শুনতে মোটেই ভাল লাগবে না।"

আমতা আমতা করে বড়কর্তা বলল, "তবুও গাঁ-দেশের লোক ওদের গান শুনলে অনেকটা বেঁচেবর্তে রইবে, ওরা তো টকি-থিয়েটার দেখতে পায় না। তুই খবর নে, ওরা লক্ষ্মীকোলের হাট থেকে কোথায় গেছে। আনা চাই কিন্তু—"

শওকত আর প্রতিবাদ না করে শুধু 'আচ্ছা' বলে চুপ করে রইল।

সরকার-বাড়ির আঙিনায় পৌঁছে বড় কর্তা বলল, "বদন চৌকিদারকে ফরমাস দিয়ে আয়, জেলেপাড়া থেকে লোক এনে খিড়কি পুকুর থেকে দু' একটা রুই-কাতলা তুলুক।"

বাইরের বৈঠকখানায় বসে হুঁকোয় কয়েকটা টান দিয়ে শওকত বের হল। যাবার সময় অন্দরের আঙিনায় এসে হাঁক দিল, "নতুন কাকি!"

নতুন কাকি সবে কাপড়-জামা ছেড়ে বড় কাকির সাথে ঘাট থেকে কাপড়-জামা কেচে গা ধুয়ে উঠোনে পা দিয়েছে। শওকতের হাঁক শুনে তাড়াতাড়ি গায়ে আঁচলটা ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে বলল, "কেন পাটনি-ছেলে?"

"মাপ চাইতে এসেছি। তোমাকে চিনতে না-পারা মস্ত কসুর। বুড়ো-হাবরা লোক, চোখে কম দেখছি আজকাল।"

নতুন কাকি নিজেই লজ্জিত হয়ে উঠল, শওকতকে বাধা দিয়ে বলল, "তোমার কোন কসুর হয় নি ছেলে। দশ বছর পর মাও-

ছেলেকে ভুলে যায়, তুমিই বা ভুলবে না কেন। কদিনই বা ছিলাম, আর কতই বা জানাশোনা।”

আপ্যায়নের হাসিতে শওকতের চোখ ছলছল করে উঠল।

“তা হলে চলি কাকি।”

“কোথায় যাচ্ছ?”

“জেলে ডাকতে, মাছ ধরতে হবে।”

বড় কর্ত্রী সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল, কাঁকনমালা তাকেই লক্ষ্য করে বলল, “মাছ দিয়ে কি হবে দিদি?”

“শওকতের নতুন কাকির খানাপিনা হবে।”

“আমার মাছ না হলেও চলে, তোমায় যেতে হবে না ছেলে।”

“যেও না বললেই যাওয়া আটকায় না, হুকুম এসেছে খোদ বড় কর্তার কাছ থেকে। সে হুকুম তামিল না করলে, শওকতের ইজ্জত থাকবে না কাকি। ঐ যে ঠাণ্ডা শান্তশিষ্ট মানুষটি, ওর মুখ থেকে যখন হুকুম বেরোয় তখন অমান্যি করবার জো থাকে না কারুরই, বুঝলে কাকি।”

কাঁকনমালা বেশ উপলব্ধি করে নিল অবস্থাটা। বড় কর্ত্রী কাঁকনমালার অপ্রস্তুত অবস্থা লক্ষ্য করে বলল, “কর্তারা যখন হুকুম করেছে, তখন তা নড়চড় হবে না। বরং—”

“বরং কি দিদি?” কাঁকনমালা যেন পথ পেল।

“শুনলি তো এখানে জোর গলায় কেউ হুকুম দেয় না, সামান্য মিনতির মত যা শোনায় তার গুরুত্ব হুকুমের চেয়েও বেশী কঠিন, বুঝলি। তার চেয়ে তুই তোর ভাসুরকে ডেকে বল, তোর কথা শুনতে পারে। যাও শও-বেটা, বড় কর্তাকে ডেকে বল, নতুন বউ তাঁকে ডাকছে।”

বড় কর্ত্রীর কথা শেষ না হতেই বড় কর্তা সশরীরে উঠোনে এসে দাঁড়াল। বড় কর্ত্রীর অসমাপ্ত কথার জের টেনে বলল, “ডাকবার আগেই বড় কর্তা এসে হাজির। এখন নতুন বৌমার আদেশটা শোনাও।”

“কাঁকন বলছিল এই অবেলায় মাছ না ধরলেও চলবে।”

বড় কর্তা হেসে উঠল, বলল, "নতুন বউরা অনেক কিছুই বলে। সে জন্মেছে পশ্চিমে, বড় হয়েছে পশ্চিমে, কাজকর্ম করে পশ্চিমে, মাছ খাওয়া তার বিলাসিতা ; কিন্তু বউমা, দেশ-গাঁয়ে মাছ না থাকলে বউ-ঝিদের পেট ভরে না।"

কাঁকনমালা প্রতিবাদ করতে চাইছিল, বড় কর্তা বাধা দিয়ে বলল, "যা বলতে চাও তা বুঝি বউমা, তোমার যুক্তি সবই ঠিক, কিন্তু কোন যুক্তিতে অবেলায় পচা পুকুরে নেয়ে এলে বলতে পার ? এটা যদি চলতে পারে তা হলে গরম গরম মাছের ঝোল আর শালি ধানের মোটা ভাত বেশ চলবে। কেমন ?"

হাসতে হাসতে বড় কর্তা দাওয়ায় উঠে বলল, "যা শওকত বদনকে বলে আয়।"

শওকত চলে গেল।

কাঁকনমালা ক্ষুণ্ণ হল কিনা বোঝা গেল না। এটুকু সে বুঝল, তার প্রতি স্নেহ কোথাও কোন ত্রুটির রাস্তা খুলে রাখেনি। সামান্য কটা মিষ্টি মিষ্টি কথার মাঝ দিয়ে নিজের অভিমতটা দৃঢ়ভাবে যে বহাল করে যায় তার ব্যক্তিত্বের ওপর তার বরং শ্রদ্ধা জন্মাল, তাকে ছোট ভাবতে পারল না।

সন্ধ্যায় আড়াই-তিন সের ওজনের দুটো কাতলা মাছ উঠোনে ফেলে দিয়ে বদন চৌকিদার চীৎকার করে ডেকে বলল, "বড় কাকি কোথায় গো, এই মাছ রইল। খিড়কির ঘাটে বড় মাছ মিলল না।"

বড় কর্ত্রী তখন গোয়ালে সাঁজাল দিচ্ছিল, সেখান থেকেই কাঁকনমালাকে উদ্দেশ করে বলল, "তুলে রাখ কাঁকন, বাগ্দী-বউ আসছে, সেই কেটে কুটে দেবে।"

বাগ্দী-বউ এসে মাছ কেটে ভাগ দিতে বসল। বড় কর্ত্রী কটা ভাগ করে কচুর পাতায় জড়িয়ে বাগ্দী-বউয়ের হাতে দিতে দিতে বলল, "এটা শও-বেটার, এটা বদন চৌকিদারের, এটা নিবি তুই, আর দুটো দিয়ে আসবি ও-বাড়ির সেজ কর্ত্রীর হাতে।"

ভাগ-বখরা করে বড় কর্ত্রী উঠে আসতেই কাঁকনমালা হেসে ফেলল।

"হাসলি যে বড় ?"

"তোমার বখরা দেখে হাসছি।"

"তোরা লেখাপড়া শিখেছিস, তোরা তো হাসবিই। বিদেশে থাকিস, তিন থালায় তো ভাত ঢালিস না। এদের বাদ দিয়ে সরকার-বাড়ি নয় রে! আগের দিনে শ্বশুর বেঁচে ছিলেন যখন, তিনি খবর নিয়ে বেড়াতেন গাঁয়ের কার ঘরে খাবার আছে আর কার ঘরে নেই। যাদের থাকতো না গোলা ভেঙে তাদের ধান পাঠাতে হত, বুঝলি। আমরা তো রাজা-জমিদার নই, চাষীর ঘরের বউ, জমির ফসল আমাদের সব কিছু। আমার যেবার বিয়ে হল, উনত্রিশ সাল। উঃ, সেকি বন্যা! বন্যায় সব ভেসে গেল। লোকে আমায় বলত বাদলা-বউ। লোকের ঘরে খুদকণাও ছিল না সেবার। উপোসে আর মড়কে গ্রামকে গ্রাম উজাড় হতে থাকে। সেদিন বউদের গায়ের গয়না খুলে দিতে হল। মহাজনের ঘরে বাঁধা রইল আমাদের সব কিছু। শ্বশুর শহর থেকে চাল জোগাড় করে এনে বিলিয়ে দিলেন গাঁয়ের ঘরে ঘরে। একদিন ছদিন নয়, দিনের পর দিন। এমনি করে গাঁ বাঁচিয়ে তবেই তাঁর সোয়াস্তি।"

কাঁকনমালা যেন রূপকথা শুনছে। সে অবাক হয়ে বড় কর্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে রইল। তার বিস্মিত মুখের দিকে চেয়ে বড় কর্ত্রী বলল, "সেদিন আর নেই। ভাগ বাঁটোয়ারা হয়ে সরকার-বাড়ির তলায় ঘুণ ধরে এসেছে, বাবুরাও এখন আর গাঁয়ে থাকতে চায় না, চাষা হতে তাদের লজ্জা করে। ভাইয়েরা মিলে কিছু কাঁচা পয়সা রোজগার করে, তাই ঠাট্ বজায় রেখে চলে যাচ্ছে কোন রকমে। তবুও যারা আপন জন তাদের বাদ দিয়ে কোন কাজ আজ অবধি করতে পারিনি ভাই। তোদের হাতে ঘর-সংসার তুলে দিয়ে এখন যেতে পারলে বাঁচি। তোরা যা হয় করবি। নে চল, ভাসুরের মাছের ঝোলটা তুই রাঁধবি নইলে রুচি নিয়ে সে খাবেই না।"

ওদিকে বাহির বাড়িতে তখন মজলিশ বসেছে। কল্কে ঠাণ্ডা আর হয় না। তামাকের ধোঁয়ায় ঘর বোঝাই। বড় কর্তা পঞ্চমুখে নতুন বউয়ের সুখ্যাতি করছে।

"জানিস মোহন, নতুন বউমা কিনা মাছ না খেয়ে থাকতে পারে। বলল, 'মাছ না হলেও চলবে।' তা চলবে বই কি! কত বছর দেশে আসেনি, এসেই কিনা তার মাছ চলবে না। তা হলে পুকুরের মাছ কার জন্য রে বাপু? ভাই, ভাই-বউ যদি জমির ধান না খেল, পুকুরের মাছ না খেল তা হলে ওগুলো দিয়ে কি হবে!"

জেলে পাড়ার মুচ্ছুদ্দি মোহন। জাল মেরে হাত পা ধুয়ে বসেছে বিদায়ী নিতে, সেই সাথে তামাকটা-আসটা সেবা পেতে। বড় কর্তার কথা শেষ হতেই মোহন বলল, "এয়োতি মানুষের মাছ চলবে না, সে কি কথা কাকা!"

"আরে সেটা তার দোষ নয়। সে যে দেশে থাকে সে দেশে তো মাছ পাওয়া যায় না। ও যে মরুভূমির দেশের লোক! তারা গরু ভেড়ার মত শুকনো বাজরার রুটি আর ডালপালা খেয়ে বাঁচে। তা বলে বাংলাদেশে বসে বাজরা খেয়ে বাঁচা যায় না। বাংলায় এলে বাঙালীর মত থাকতে হবে।"

পাশ থেকে জসিম বলল, "তাই ওরা আমাদের বলে মছলি-খোর; তোরা পাস না তাই খাস না।"

জসিম নিজের রসিকতায় নিজেই হো-হো করে হেসে ওঠে।

শওকত কখন যে দাওয়ায় এসে বসেছে তা কেউ লক্ষ্য করেনি। সে এতক্ষণ তাদের কথাবার্তা শুনছিল, অনাবশ্যক বিবেচনায় কোন কথাই বলেনি। জসিমের হাসি শেষ না হতেই শওকত উঠে এসে ঘরের চাটাইয়ে বসল।

"একটা খবর শুনলাম কাকা।"

ব্যস্তভাবে বড়কর্তা বলল, "কি খবর?"

"শুনলাম সোঁতার ওপার বরাবর সব জমি নাকি চিনি-কোম্পানী কিনে নিচ্ছে।"

"আমিও শুনেছি, তবে পাকাপাকি কিছু শুনিনি।"

"সত্যিই যদি নেয় ?"

"'ক্ষতি কি তোদের, দাম পাবি।"

"দাম পাব ঠিকই, কিন্তু সে টাকা দিয়ে হবে কি ; জমিই তো চাষার গরব, সেই জমিই যদি না থাকে তা হলে চাষার আবার রইল কি ?"

"অত এখন ভাবতে হবে না, যদি কখনও চিনির কল বসে, আর জমি কিনতে চায় তখন দেখা যাবে।"

শওকত কিন্তু খুশী হতে পারল না বড় কর্তার উদাসীনতায়। কেমন একটা অশান্তি তার মনের কোনে জট পাকিয়ে রইল। মুরুব্বিদের কাছে শুনেছে, যখন রেল লাইন পাতা হয় তখনও নাকি এমনি কানাঘুসা কথা শোনা যেত। তারপর এল আমিন, জমি জরীপ হল। তারপর সরকার থেকে জমি দখল করা হল। দাম দেবে বলে জমি নিল, সে দাম পেতে আরও ছ-সাত বছর কেটে গেল। যার জমি গেল সে করল ছ' বছর ধবে উপোস। সরকারের কাছ থেকে টাকা আদায়, বাপ্‌রে বাপ্‌ ? শওকত আবার বলল, "তোমরা আমার কথা হেসে উড়িয়ে দিও না কাকা, জমি গেলে চাষা মরবে।"

বড় কর্তা বাধা দিয়ে বলল, "জমি যাবে কেন, যার জমি সে যদি না দেয় তা হলে কারুর ক্ষমতা আছে তা নেয়।"

"সরকারী হুকুমে যদি তা নেয়।"

"সরকারের তো খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, চিনির কলের জন্য জমি নেবে ; সেই জমির জন্য হুকুম দখল হবে। থাম দেখি, তোরা আমার মাথা খারাপ করবি দেখছি। কাল শহরে গিয়ে সব খবর নিয়ে আসব, তোরা ততক্ষণ চুপ করে থাক।"

পরের দিন বড় কর্তা পাকা খবর শুনে এল ফৌজদারী কোর্টের আমলাদের কাছ থেকে। চিনির কল বসবে বড়ভিটের সোঁতার বরাবর উজানে। তিন মাইলে যত জমি আছে সব তারা কিনে নেবে।

নতুন রাস্তা হবে, বিজলী বাতি জ্বলবে। যারা জমি বিক্রি করবে তারা চিনির কলে চাকরি পাবে, মাসে মাসে মাইনে পাবে।

কথাটা ক্রমে ক্রমে কাঁকনমালার কানে উঠল।

শওকতকে ডেকে কাঁকনমালা জিজ্ঞেস করল, "জমি তোমরা দেবে নাকি পাটনি-ছেলে?"

"আমি কি দেবার কর্তা? আমি না দিলেও দেবার লোকের অভাব হবে না নতুন কাকি। নগদ কড়ির বড়ই লোভ, তার ওপর ওদের কলেই চাকরি দেবে একি কম কথা। নাকের বদলে নরুন পাবে তা কি বোঝ না?"

কাঁকনমালা কোন কথা না বলে সোজা গিয়ে উঠল বড় কর্ত্রীর ঘরে। বড় কর্ত্রী তার চলন দেখে থমকে গেল, জিজ্ঞেস করল, "কি হয়েছে কাঁকন?"

"কিছু নয় দিদি, আজকে বড়ঠাকুর আসবেন কি?"

"তার কথা সে নিজেই জানে না, আসতে পারে মনে হচ্ছে। তোর আবার কি দরকার পড়ল?"

"এমন কিছু নয়, একটা খবর জানতে হবে।"

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে কাঁকনমালা দেখতে পেল শওকত তখনও উঠোনে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

"আর একটু দাঁড়াও পাটনি-ছেলে। আমাকে সাথে নিয়ে সবার বাড়িতে একবার আজকেই যেতে হবে।"

"তোমাকে যেতে হবে না কাকি, হুকুম করলে সবাইকে তোমার দোর গোড়ায় ডেকে আনতে পারি।"

"তা হলে তাই কর, দেখি কলওয়ালারা জমি পায় কোথায়?"

কথা শেষ করে কাঁকনমালা যেন রাগে ফুঁসিয়ে ওঠে। তার সীমাবদ্ধ ক্ষমতাকে একবার নেড়ে চেড়ে দেখবার ইচ্ছা হল। শওকত ভাবতে ভাবতে বেরিয়ে গেল।

সাত

জমি দেবার মৌখিক ইচ্ছা কারুরই প্রকাশ পেল না সত্যি, কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল শহর থেকে গাঁ অবধি দেড় মাইল মাঠটার তিন ভাগের একভাগ জমি কলওয়ালা বাবুরা কিনে নিয়েছে। রেজিস্ট্রি অফিসে পাইকারি হারে হস্তান্তরের কবালা জমা পড়তে লাগল। চোত মাসের মাঠে ফসল নেই, দখল নেবার হাঙ্গামাও নেই, আলের পাশে খুঁটা গেড়ে সীমানা টেনে নিল কলওয়ালা বাবুরা। কাঁকনমালা সংবাদটা পাকাপাকি ভাবেই ক' দিন থেকে শুনছে। অনেককেই বারণ করে পাঠিয়েছিল, কিন্তু ফলাফল যা হবার তাই হয়েছে। নগদ টাকার ঝন্‌ঝন্ আওয়াজ যে কত মিঠে তা গাঁয়ের চাষীরা যত বুঝল, কাঁকনমালা অত বুঝল না; তাই ভুঁড়িওয়ালাদের দালালরা অতি সহজেই কাজ উদ্ধার করল। এমন নির্বিঘ্নে কাজ হাসিল হলেও পশ্চিম পাড়ার মাঠের জমিগুলো হাতাতে না পেরে দালালরাও ঘেমে উঠল।

ওসব জমির মালিক শওকত বেপারি আর জসিম শেখ, কিছুটা জমি সরকারদের, তারও ভাগচাষী জসিম। সরকারদের জমির ওপর দালালরা নজর দেয়নি। তাদের বেশী নজর শওকতের জমির ওপর। কিছুতেই যখন শওকতের জমি পাওয়া গেল না তখন কলওয়ালা বাবুরা মনে মনে খুশী হল এমন নয়, কিন্তু কিছু করবার সামর্থ্য তাদের নেই, যদি থেকেও থাকে তা প্রয়োগ করবার সময় তখনও হয়নি। এটা তারা জানে ও বোঝে, তাই বেখাপ্পা হলেও মাঝের জমিগুলো বাদ দিয়েই চার পাশের জমিতে কারখানা গড়ে তুলতে লাগল। ইট, সিমেন্ট, টিন, চোঙ, আরও যন্ত্রপাতি এল, সাথে এল মিস্ত্রি, ছুতোর আরও অনেকে; কেউ দেশের নয়, দেশী ভাষায় কথা বলে না, সবাই বাইরের আমদানি। যারা জমি বেচে নগদ টাকার উশুল পাচ্ছিল তাদের কড়িতে টান ধরল, তারা ছুটল

কলের হাতায়। কলওয়ালারা ওয়াদা করেছিল কাজ দেবে। তারা কাজও দিতে চাইল। তবে নেহাৎ কাজের মত গুণপনা নেই কারুরই তাই কাজ জুটল দিন মজুরের। সকাল আটটা থেকে সন্ধ্যে অবধি কলের হাতায় বোঝা বয়ে দিন কাটায় তারা।

এত তাড়াতাড়ি ঘটনাগুলো ঘটে চলছে অথচ কোথাও কোন প্রতিবাদ হল না, নিস্তরঙ্গ জলাভূমির বুকে শুকনো খড়কুটোর মত ভেসে বেড়াতে থাকে ভূমিহারাদের দৈনন্দিন জীবনের ধারা।

কলের দালালরা কিন্তু আশা ছাড়েনি। শওকত বেপারির কাছে মাঝে মাঝে কলের দালালরা আসে, জমি চায়, টাকার লোভ দেখায় কিন্তু শওকত মাথা হেলায় না। প্রথম প্রথম হেসে বলত, "মোছলমানের জমি, কোথায় কোন ফ্যাসাদ রয়েছে কে বলতে পারে, তার চেয়ে এ জমি নিও না বাপু, ফারাজ হয় নি। আখেরে হাঙ্গামা হবে, পস্তাতে হবে, বুঝলে ?"

দালালরা নিমরাজি মনে করে নাছোড়বান্দার মত তার বাড়ি আর ঘাট পাড়ি দিতে থাকে অনবরত।

বুড়ো শওকত মনে মনে হেসেই বাঁচে না। একদিন বলল, "বুড়ো মানুষ, মাটি করতে দাঁত পড়ে গেছে বাপু, নতুন করে মাটি আর করবার মত বয়সও নেই, হিম্মতও নেই, তার চেয়ে শক্ত দাঁতের পুত রয়েছে, আমি মরলে তার কাছ থেকে জমি নিও, সে নতুন জমি করতে পারবে। আমার সে সামর্থ্য নেই।"

দালালরা বুঝল বুড়ো দাঁও মারতে চায়। দু শ' টাকার জমি তিন শ' টাকায় কিনতে চাইল, তবুও শওকত মাথা ঝোঁকায় না। জমির দাম উঠল চার শ'।

অবাক হয়ে শওকত বলল, "বল কি কর্তা, চার শ' টাকা জমির বিঘে। আমার বাপ-দাদার কালে কখনও শুনিনি বাপু। এ তো টাকা দিয়ে কেউ জমি কেনে ? ও টাকা দিয়ে জমি পয়দা করে নাও না কেন !"

কথার শেষে শওকত হেসে উঠল।

"হাসির কথা নয় মিঞা। জমিটা বাবুদের দরকার, নইলে ডবল দাম দেয় কেউ ?"

"তা-কি বুঝিনা বাপ্। চুল সাদা হবার সাথে সাথে বুঝবার বয়স কমে না। বুঝবার ক্ষমতা কি এখনও হয়নি মনে কর। কিন্তু জমি দিতে পারব না।"

দালালদের ধৈর্য বোধ হয় শেষ হয়ে এসেছিল। তারা বলল, "দেবে না একথা কেন বললে না এতদিন, তা হলে এতদিন তোমার পেছন পেছন্ ফেউ-ফেউ করতাম না।"

"দেব এমন কথা তো বলিনি। অনর্থক ঘুরছই বা কেন ? ডেকেছিলাম তোমাদের ?"

ন্যায্য কথাটা দালালরা সইতে পারল না। তারাও প্রতিবাদ করে বলল, "মুখেই কি সব কথা বলে, কাজে-কম্মে হাব-ভাবেও লোকে বলে।"

"হাব-ভাবে ? ওঃ! শওকত বেপারি বুড়ো হয়ে গেছে সত্যি, কিন্তু একদিন এই বেপারির বৈঠার ঘায়ে এ রাস্তায় চোর-ডাকাত অবধি হাঁটতে সাহস পেত না, বুঝলে ? টাকা দিয়ে শওকতের জমি কেনা যায় না, বুড়ো হাড়ে এখনও দুব্বো গজায়নি, মানে মানে পথ দেখ। এ রাস্তায় আর এস না, তা হলে বুড়ো কব্জির শক্ত গাঁট্টা পড়বে তোমাদের ঐ নরম হাড়ের খুলিতে, বুঝলে !"

দালালরা সেই যে গেছে আর আসেনি। মাঝে একবার কাটা ধান আনবার সময় কলওয়ালাদের জমি দিয়ে আসতে না দেওয়াতে কিছু গণ্ডগোল হয়েছিল, সেও সাময়িক। শওকতের ধান আটকাতে ভোজপুরীর একখানা হাত হাসপাতালে রেখে আসতে হয়েছিল, সেই থেকে আর কেউ কোনদিন শওকত বেপারির হকের ধনে হাত দিতে সাহস পায়নি।

পারঘাটায় বসে বসে শওকত গাঁয়ের সব খবরই পেত। তেরো বিঘে জমি বিক্রি করে মোকশেদ অনেক টাকা পেয়েছে। টাকা

পাবার সাথে সাথে চার বাণ্ডিল ঢেউ-টিন এনে ঘর ছেয়েছে, আগ্-পাড়ার নুরুমোল্লার বিধবাকে নিকে করে এনেছে, প্রথম পক্ষের সাত বছরের মেয়ে পাতার বিয়ে দিয়ে মোক্ষলাভ করেছে। শওকত শুনেই অবাক।

"বলিস কিরে পটলা, মোকশেদের ঘটে কি একটুও বুদ্ধি নেই।"

"হাঁ বড় মিঞা, সব টাকাও ফাঁকা হয়ে গেছে। দু'এক মাস পর হাঁড়ি চড়বে না তার।"

শওকত নিজেকেই বিপন্ন মনে করছিল। এত বড় দুর্ঘটনাটা যেন তার বুকের ওপর বসে মোকশেদ ঘটিয়েছে এমনি ভাবেই ঘটনাকে গ্রহণ করল সে। হাত থেকে হুঁকোটা নামিয়ে জিজ্ঞেস করল, "সেই গাধাটা কি করছে এখন?"

"কলে জন-খাটছে। সাড়ে তেরো আনা মজুরি।"

সাড়ে তেরো আনা! যার ঘরে একশ' মন ধান উঠত সে পাচ্ছে সাড়ে তেরো আনা সকাল থেকে সাঁঝ অবধি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে। শওকত অনেক কথাই শুনেছে, এমন বেইমানির কথা শোনেনি।

হুঁকোর মাথা থেকে কল্কেটা নামিয়ে দুহাতের তেলোতে বসিয়ে পটলা কসে ক'টা টান দিয়ে বলল, "হাঁ চাচা, তাও ছিল ভাল। কাজ তো আধা সালের। আধা সাল কল বন্ধ, মজুরি বন্ধ। তখন যে কি হবে। সাতাশ জনের এই হাল হয়েছে। দু'তিনজন শলা-পরামর্শ করে ভেদরার মাঠে নতুন ক'বিঘে জমি নিয়েছিল, তারাই বোধ হয় বাঁচবে।"

সত্যিই তারা বাঁচল।

বাঁচল না মোকশেদ আর তার মত ক'জন হতভাগা। শেষকালে মোকশেদ দু'তিন মাস পরে শওকতের ঘাটে এসে কেঁদে পড়ল।

"চাচা বাঁচাও।"

"মরবার সময় চাচাকে জিজ্ঞেস করেছিলি রে বেইমান। এখন চাচা বাঁচাও! মরদের বাচ্চা মরদ, চোখে তোর পানি। গলায় দড়ি দিসনে কেন?"

"মুখ্যুলোক!" কৈফিয়তের সুরে জবাব দিল মোকশেদ। ভুলের মাশুল বেশ ভাল ভাবেই যে তাকে দিতে হচ্ছে সে বিষয় আর কোন সন্দেহ রইল না।

শওকত খিঁচিয়ে উঠল। বলল, "মুখ্যু শুধু জমি বেচার বেলায়। দু'টো বিয়ে করতে তো মুখ্যামি করিস নি। যা দূর হয়ে যা।"

মোকশেদ এতটা আশা করে নি। গামছার খুঁটে চোখ মুছে মাথা নীচু করে সে উঠে গেল।

মোকশেদের চলার পথের দিকে চেয়ে শওকতের বুক ফেটে যাচ্ছিল। ক'মাস আগেও এই মোকশেদ ছিল গাঁয়ের মুরুব্বি, মোটা ভাতের অভাব তার কোনদিন হয় নি। বুক উঁচিয়ে চলতে তার মত ক'জনই বা পারত? আজ সেই মোকশেদ নুয়ে পড়েছে কেমন অসহায় ভাবে।

বিকেল বেলায় খবর পেল মোকশেদ বারোহাটের জগৎ-বিশ্বাসের গদিতে ঘরের চার বাণ্ডিল টিন জলের দামে বিকিয়ে দিয়েছে। কিছুই রইল না তার। খবর শুনে শওকতের মুখ থেকে শুধু একটিমাত্র শব্দ বেড়িয়ে এল 'আল্লাহ্'।

কাঁকনমালা চলে গেছে। সে থাকলে তার সাথে সলা-পরামর্শ করতে পারত। এমন দুর্যোগের মাঝে নিজেকে বড়ই অসহায় মনে করছিল। মোকশেদকে টেনে তোলবার নৈতিক দায়িত্ব যেন তারই, অথচ শওকত ভেবে কিনারাই করতে পারে না কেমন করে মোকশেদকে বাঁচান যায়। শুধু একটা মোকশেদ তো নয়, এরকম আরও কয়েকগণ্ডা মোকশেদ রয়েছে, তাদের রক্ষা করে কার সাধ্য! চিরকালের অভ্যাস আপদে বিপদে সরকার-বাড়ির আশ্রয় গ্রহণ করা, সেই পুরাতন অভ্যাস মতই সন্ধ্যাবেলায় সরকার-বাড়ির দাওয়ায় গিয়ে বসল।

বড় কাকি গোয়ালে সাঁজাল দিয়ে আসতেই তার সাথে দেখা। সেও জানে শওকত সহজে আসবার পাত্র নয়, কোন কিছু না ঘটলে আজকাল আর সরকার-বাড়ির আঙিনায় শওকত পা দেয় না।

জানবার কৌতূহলটা দমন করে শওকতের দিকে শুধু মুখে তুলে তাকাল। শওকতের মুখে রাজ্যের কালো মেঘের ছায়া। বড় কর্ত্রীর জিজ্ঞাসু দৃষ্টির সামনে শওকতও মুখ তুলে ঝাপসা চোখের ওপর গামছার খুঁট টেনে দিল।

"কাঁদছ কেন শও-বেটা।"

"কাঁদন আর নাই বড়কাকি।" ধরা ধরা গলায় জবাব দিয়ে গামছায় চোখ মুছে নিল। বলল, "হাঁ কাকি, তোমাদের রতনপুরের জলা জমিগুলো কাউকে ভাগ-চাষে দিয়েছ কি ?"

"তোমার বুঝি ভাতে টান ধরেছে ?"

"হায় আল্লাহ্, তা হলে তো বরং চাষ করতাম। কলওয়ালা বাবুরা কি যে দুশমনি করল !"

বড় কর্ত্রী নতুন কোন অনিষ্টের আশঙ্কায় থমকে গেল। বলল, "আবার কি হল ?" তার আশঙ্কা অমূলক নয়, সেবার সেই ভোজ-পুরীর হাত ভেঙে দিয়ে শওকত এসে সরকার-বাড়ির আঙিনায় এমনি-ভাবে বসেছিল, সেদিন সে কাঁদেনি, কি যেন উত্তেজনায় তার মুখ-চোখ শক্ত হয়েছিল। বৃদ্ধের পেশীগুলো পাথর-খোদাই মূর্তির মত শক্ত নিরেট মনে হয়েছিল। দৃষ্টিতে উত্তাপ ছিল, নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা ফেটে পড়ছিল। আজ যেন সবই স্বতন্ত্র।

"নতুন কিছু হয় নি, যা হবার তা হয়েই গেছে। যাদের জমি গেছে তারা এখন খেতে পায় না। নগদ কড়ি দেখে নোলায় পানি এসেছিল, সামলাতে পারে নি। এখন মুখ্যু চাষারা ভিরমি যাচ্ছে। সেই সব বেইমানের দল এখন ধুঁকে ধুঁকে মরছে, ভাত পাচ্ছে না।"

"কাঁকনবউ তো অনেক বুঝিয়েছিল, তারা তো শুনল না।" অনুযোগের ক্ষীণ সুরে বড় কর্ত্রী কথাটা বলেই কেমন অসোয়াস্তি বোধ করছিল। হঠাৎ মনে হল পুরাতন ভ্রমকে সংশোধন করবার উপায় আঘাত দেওয়া নয়, মমতার অঙ্গুলি নির্দেশই বোধ হয় ভ্রম সংশোধনের একমাত্র পথ।

শওকতও প্রত্যুত্তরে অনুযোগ জানিয়ে বলল, “একেই তো বলে চাষার বুদ্ধি। নইলে সুখে থাকতে জিন-পরীতে কিলোয় কাউকে। এই দেখ না, আমাদের মোকশেদ। জমি বিক্রি করে কয়েক কুড়ি ট্যাকা পেয়ে ঘরে বসাল ঢেউ টিন, নিজে করল নিকে, মেয়ের দিল বিয়ে, ট্যাকা সব ফু-ফ্যা হয়ে গেল। এখন হাঁড়ি চড়ে না। তাই বলছিলাম, তোমাদের ঐ জমিটা থাকলে পাঁচ-ছ-জনের ভাত জুটত। জলা জমিতে আবাদ করা কঠিন, তবুও মানুষকে বাঁচাতে হলে কঠিনকেও সহজ বলে মাথায় তুলে নিতে হবে। সে যা হয় হোক. তুমি একটু বড় কাকার কাছে শুনে নিও কাকি, যদি বন্দোবস্ত না হয়ে থাকে, তা হলে মোকশেদ-ছিচরণ এদের যাতে দেওয়া হয় তা একটু বড় কাকাকে বলবে কিন্তু।”

অনেকগুলো কথা একসাথে বলে শওকত হাঁপিয়ে উঠল। বড় কর্ত্রী অবস্থার গুরুত্ব বেশ বুঝল, শওকতের অসহায় মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, “বেশ, দেখব জিজ্ঞেস করে। তবে তোমার কাকা এলে তুমিও এসে বল কিন্তু।”

পরের দিন সকাল বেলায় শওকতের ডাক পড়ল সরকার-বাড়ির আঙিনায়। বুঝতে পারল সবই। কথাটা বড় কর্তার কানে গেছে। এবার একটা পথ হবে, শেষ অবধি ফয়সালাও হতে পারে।

শওকত আঙিনায় পা দেওয়া মাত্র বড় কর্তা হেঁকে বলল, “তোর কথা শুনলাম শওকত, কিন্তু ওরা জমি রাখতে পারবে কি! কলের টানে ওরা জমি নষ্ট করবেই করবে। তবে তুই যখন বলছিস তখন দিচ্ছি ওদের হাতে, পরে কিন্তু দোষ দিসনে। ওরা কাঁচা তামার পয়সাকে ময়লা সোনার বাজুর চেয়ে বেশী দামী মনে করে।”

শওকত কোন জবাব খুঁজে পেল না, এত সহজে কাজ উদ্ধার হবে তা ভাবতেও পারেনি। বড় কর্তা যখন বলেছে তখন আর সে কথা বদল হবে না। একথা সবাই জানে। তাই ডাকতে চলল মোকশেদ আর ছিচরণের দলকে।

বিকেল বেলায় নতুন রাজিনামায় টিপ দিয়ে মোকশেদ আর ছিচরণের দল জমির আধিয়ার হল। তারাও বুঝল নিশ্চিত মরণের হাত থেকে তারা বেঁচে গেল।

"কিন্তু চাচা—" ছিচরণ অতি বিনয়ের সাথে বলল।

"আবার কিন্তু কি ?"

"হাল গরু সব তো গেছে, বীজ ধান কোথায় পাই ?"

"অত আমি জানি না। বৃষ্টিতে মাটি নরম হয়েছে, এবার যেখান থেকে পারিস হাল জোগাড় কর, বীজ না হয় আমি দেব।"

ছ'জন চাষীর রুজিরোজগারের ব্যবস্থা করে শওকত ফিরে এল ঘরে। এসেই চৌকিতে চাটাই টেনে শুয়ে পড়ল। পরিতৃপ্তির ভিতর দিয়ে এত বেশী ক্লান্তি এসে গেছে যার ফলে সে নিজেকে চাটাইয়ের ওপর এলিয়ে দিতে বাধ্য হল, শুয়ে শুয়ে বিগত দিনের স্খলিত দিনগুলোর কথা ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। পরী না ডাকলে সে বোধ হয় হুঁসই ফিরে পেত না।

"বেলা থাকতে শুয়ে পড়লি কেন ?" পরী ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল, "শরীর ভাল আছে তো ?"

"আছে। এক বদনা পানি দে তো।"

পরীর সন্দেহ গেল না। গায়ে হাত দিয়ে তাপ পরীক্ষা করে তবে গেল জল আনতে।

চোঁ-চোঁ করে প্রায় এক বদনা জল খেয়ে শওকত হাঁফ ছাড়ল।

"জানিস পরী, ওপারে কল বসেছে।"

'তা আর জানি না, সকাল বেলায় মুর্গী ডাকার সাথে সাথে ভোঁ ডাকে।"

শওকত হাসল।

"ভোঁ কেন ডাকে জানিস ? তাজা বোকা মানুষগুলোকে পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে হজম করতে চায়। একদিনে তা পারছে না, ধীরে ধীরে হজম হয়ে যাবে বুঝলি। এমনি ধারা হজম হয়ে গেছে আমাদের

মোকশেদ আর ছিচরণের দল, যারা নগদ কড়ি দেখে মাটি বেচে এল, কারুর কথা শুনল না।"

"তাতে তোর কি ?"

"আমার আর কি। পিতিবাসী না খেয়ে মরবে, বুঝলি তো, তাই জানটা টন্‌টন্ করে। আল্লার মাল, আল্লার পয়দা।"

"আল্লার মাল আল্লাই বাঁচাবে, তোকে অত ভাবতে হবে না। হাঁ, তারা যদি তোর কথা শুনত তা হলে না হয় হা-হুতোশ করতি। তা নয়, কারুর ঘরে আগুন আর তোর চোখে পানি।"

শওকত পরীর কথাগুলো সহ্য করতে পারছিল না। প্রতিবাদের সুরে বলল, "তোর যদি এমন হত।"

"যা হয়নি তা নিয়ে পরীবিবি ঘাড় চুলকোয় না। নে ওঠ, খেয়ে নে, নাস্তাপানি কর।"

শওকত বুঝতেই পারে না, কেমন করে পরী এমন হৃদয়হীন হয়ে উঠল। এই ক'বছর আগে বন্যায় যখন গাঁয়ের পর গাঁ ভেসে গিয়েছিল, পরীই সবার আগে জমান ধান বের করে দিয়েছিল জলডোবা গাঁয়ের মানুষদের বাঁচাতে। রইত যদি নতুন কাকি তা হলে পরীকে বোঝান যেত।

শওকত গুম হয়ে বসে থাকে।

পরী অনেকক্ষণ সাধাসাধনা করে বুঝল তার কথায় শওকত মনে কষ্ট পেয়েছে। তিরিশ বছরের ইতিহাসে পরী কোনদিন শওকতের মনে কষ্ট দেয় নি, হঠাৎ কেনই বা সে এমন করল।

বলল, "তুই রাগ করলি ?"

"নাঃ।"

"না বললেই বুঝি সব 'না' হয়। তা হলে খেতে উঠছিস না কেন ?"

শওকত গুমরে গুমরে বলল, "তোর কি মনে হয় এতগুলো লোক না খেয়ে থাকলে তুই দানা মুখে দিতে পারবি !"

পরী কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে রইল।

"জবাব দিচ্ছিস না কেন ?"

"বেপারীর বেটা তুই, তুই বুঝবি বেপার। আমি ভাত রাঁধি, বাসন মাজি, অত বুঝি না। তবে আল্লার জাহানে উপোস কেউ করলে পিতিবাসীর মুখে অন্ন রোচা উচিত নয়, এ তো নতুন কথা নয়।"

শওকত খুশীতে ফেটে পড়ল, "তাই বল। তবে কেন অমন কথা বললি ?"

"সব সময় এক কথা ভাল লাগে না বাপু," বলেই পরী দাওয়া থেকে নেমে গেল।

শওকত হাসল।

জীবনের সায়াহ্নে দাঁড়িয়ে শওকত বোধ হয় চলে যাওয়া দিনগুলিকে অন্তরের অন্তঃস্থলে তোলপাড় করে দেখছিল,—এমনি সাবধানী শাসন আর উদাসীনতা দিয়ে পরীজান তার কতটা অধিকার করে রেখেছে।

আট

ওপারে সকাল বেলায় ভোঁ বাজে, এপারে যারা জমি বিকিয়ে মজুর হয়েছে তারা ছোটে হাজিরা দিতে, যারা জমি বিকোয়নি তাদের অনেকেই আখের কুশি ওঠায়, চাষ করে। ফলন বেশি, পয়সা বেশি। নগদ চকচকে পয়সা। ছ' আনা মণ দরে দাদন নিয়ে দুশ' আড়াইশ' মণ ফলন পিঠে বয়ে পৌঁছে দিয়ে আসে কলের গুদামে। যাদের জমি কম তারাই আগাম টাকা ঘরে তুলে জমির বুকে আধমরা বলদ ঠেঙিয়ে পয়সা আনবার ফন্দি খোঁজে।

এবার চার বিঘেতে আখ চাষ দিয়েছে দশা মণ্ডল, দেড় বিঘেতে চাষ দিয়েছে বদন চৌকিদার। দশার পয়সা না হলেই নয়। ছোট বোনটা ঘর পালিয়ে হাকিমের আয়া হয়েছে, দেশে যখন আসে টাট্টু ঘোড়ার মত গোড়ালি উচুঁ জুতো পায়ে দিয়ে টগ্‌বগ্ করে ঘুরে বেড়ায়। হালিমা ভাইকে বুঝিয়ে দিয়েছে, নগদ পয়সাটাই আসল, পয়সা থাকলে রুটি-রুজি বাজার থেকে দৌড়ে এসে তার ঘর বোঝাই করবে। হাকিমের আয়া, শহুরে বোন, তার উপদেশ মেনে নিয়ে সে

আখের চাষে নেমেছে। বদন চৌকিদারের মান্যি গেছে কমে। মন্ত্রী এসে বয়ান দিল ইস্কুল-পাঠশালা টিউকল আরও কত কি হবে, শেষ অবধি যখন কিছুই হল না, তখন সে বুঝল, পয়সাওয়ালাদের কথার ঠিক থাকে না কিন্তু ট্যাকের কড়ি ঠিক থাকে। গাঁয়ের লোক আর তার কথার বিশ্বাস করে না। তাই সেও পয়সা তৈরীর কারখানা করল জমির দাদন নিয়ে আখ চাষ করে।

বাপঠাকুরদার মুখে অনেকবার শুনেছে নীল চাষের কথা। নীলের দাদনে গাঁকে গাঁ উজাড় হয়ে গেছে। জমির দাদন এক পুরুষে শোধ হয় না কোনকালেই। বদনকে ডেকে শওকত মানা করেছিল, জবাব পরে দেব বলে বদন আর তার পারঘাটার পথ কখনও মাড়ায় নি।

বউকে এসে বলল তার দাদনের কথা। সরকারী চাকরি আর সে করবে না, আখের চাষ করে আর পাইকার সেজে পয়সা কামাবে। এমনিতে সরকারী চাকরি কেউ পায় না আর সেই চাকরি ছেড়ে চাষ-ব্যবসা করবে, তাজ্জব কথা। বউ প্রতিবাদ করতেই সে খিঁচিয়ে উঠল। সরকারী মেজাজটা তার ঠিকই আছে। হলই বা সে চৌকিদার।

মহারানীর চাকরি! মহারানীর চাকরি ছেড়ে বাবুরা জেলে গেল। সায়েবরা নাকি চলেই যাচ্ছে, আবার চাকরি কিসের?

অবাক হয়ে বউ বলল, "সে আবার কি কথা! এই সেদিনও তো তুমি বলেছ মহারানীর চাকরি ছাড়ব বললেই ছাড়া যায় না।"

"যায়, যায়, ওসব তুমি বুঝবে না।"

"তাই বলে চাকরি ছাড়বে?"

"ছাড়ব মানে কলে একটা চাকরি পেয়েছি, মাইনে বেশি। তার ওপর আখের চাষ তো রইলই।"

"ওসব কর না বাপু, যেমন চলছে তেমনি চলুক। তার চেয়ে জাত ব্যবসায় হাত দাও তাতেই পেট ভরবে। কলের কাজে কারুরই মান থাকে না, এখনও পাঁচ গাঁয়ের লোক চৌকিদারের গিন্নী বলে কম্বল পেতে দেয়। কোথায় সরকারী চাকরি আর কোথায় কলের ঘানি।"

ঘরে কোন অনুমোদন না পেয়ে বদন বেরিয়ে পড়ল। ওপাড়ার নিশি আর উমেদ আখ চাষ করেছে, তার সাথে কলেও নগদানগদ পাচ্ছে। তারা বেশ আনন্দেই আছে। বদন যদি ওরকম কাজ করে তাতে দোষের কি? অনেক ভেবে চিন্তে আবার শওকতের কাছে গেল।

খোলসান থেকে মাছ তুলতে তুলতে বদনের বক্তব্য সবটা শুনে নিয়ে শওকত মুখ তুলে একবার হাসল। বলল, "ভালই করেছিস। রাতের বেলায় গাঁ পাহারা যখন দিবি তখন আখের ক্ষেতটাও পাহারা দিস। জানিস তো আখের ক্ষেতে শেয়াল পণ্ডিতের মাদ্রাসা বসে।"

বদন হো-হো করে হেসে উঠল, বলল, "তা যা বলেছ চাচা। শেয়াল তাড়াতে না পারলে আখের ক্ষেত রাখা দায় হবে।"

শওকত সেই সাথে সাথে হেসে বলল, "তাই তো ভাবনা। রস খেয়ে ছিবড়ে না রেখে যায়। তোদের যেমন ভাব-সাব শেষ অবধি ছিবড়ে চুষে না মরিস।"

বিদ্রূপটা এতক্ষণে বদন বুঝল। বুঝতে পেরেই উঠে যাচ্ছিল। শওকত ডেকে বলল, "এলিই বা কেন আর চললিই বা কেন?"

হাঁটু গেড়ে সোঁতার কিনারায় বসে বদন বলল, "একটা যুক্তি পরামর্শ নিতে এসেছিলাম।"

"এর মধ্যেই নেওয়া শেষ হয়ে গেল বুঝি? দর্মা তো বেড়েছে, আর নতুন খবর কি রয়েছে?'

"ভাবছি চাকরি ছেড়ে দেব।"

"ভাল কথা। এবার নিয়ে কবার হল? তারপর কি করবি?"

"কলে চাকরি নেব।"

"কলে চাকরি করবি! সে তো ছ'মাস, আর ছ'মাস? দেখছিস না, যারা জমি বিক্রি করেছিল তারা তাদের নিজের জমিতেই মজুর খাটছে? তুই কি চাস, ওমনি ধারা সব হারিয়ে মেঠো বস্তি হবি?"

"তা হলে চাকরি ছাড়ব না?"

"তাই তো আমি বুঝি।"

"নিশি-উমেদ ওরা তো পয়সা কামাই করছে বেশ। আমি কি কম পাব ওদের চেয়ে। ওরা তো সুখেই আছে।"

খোলসানটি ভাল করে ভাটির মুখে আটকে রেখে শওকত উঠে এল ডাঙায়। গামছা দিয়ে গায়ের জল মুছতে মুছতে বলল, "সুখ, তা বটে! যাদের পয়সা কম, সুখ তাদের চিরকালই কম; পয়সার সুখ বড় সুখ তবে সবার সয় না, বুঝলি?"

সব কথা বদন বুঝল কিনা তা তার মুখের চেহারা দেখে বোঝা গেল না, তবে সে আর কোন প্রশ্ন না করে ধীরে ধীরে ডিঙিতে উঠে কল্কেতে তামাক ভরতে লাগল। হঠাৎ কি যেন ভেবে বলল, "নতুন কাকিকে একখানা চিঠি লিখলে কেমন হয়, চাচা? সেই তো সেবার সবাইকে মানা করেছিল, নইলে এ মাঠের এক ফালি জমিও থাকত না।"

শওকত যে একথা ভাবে নি এমন নয় কিন্তু সত্যিই তাতে কোন লাভ হবে কি? নতুন কাকি হাজার হলেও মেয়েমানুষ, সে লড়াই করতে পারবে বলে ভরসা কম। নতুন রাস্তা জরীপ হচ্ছিল। সরকার হুকুম-দখল করছিল জমিজমা। জরীপের মাপে যার জমি পড়ছিল তাকেই ছাড়তে হচ্ছিল জমি। যাদের সম্বল মাত্র পাঁচদশ কাঠার বাস্তু, তারা যাবে কোথায়? নতুন করে বাস্তু তারা কোথায় পাবে! বড় কর্তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কি হবে?' বড় কর্তা আজকাল যেন কেমন হয়ে গেছে, আগের মত জোর দিয়ে কোন কাজ করতে পারে না। জিজ্ঞেস করলে বলে, 'জানিস তো বুড়ো হতে চলেছি?' তা বই কি! শওকতের বয়স ষাটের কোঠায় এল, সে এখনও ভাল করে বুড়ো হতে পারল না, আর সেদিনকার বড় কর্তা কিনা এখনই বুড়ো হতে চলেছে। আসলে মনটা তার বুড়িয়ে গেছে, জোর কদমে মনের কথা বলতে পারে না। শওকত ভেবেছিল, নতুন কাকি থাকলে তার এ সমস্যাগুলোর সমাধান খুঁজে দিতে পারবে। কিন্তু নতুন কাকি তো তার হাত-ধরা লোক নয়। মনে করলেই তাকে ডেকে আনা যায় না। লেখাপড়া জানা মেয়েছেলে, চাকরি করে পয়সা

আনে ঘরে, দিলটা তার কম দরদভরা নয়, কিন্তু সে থাকে অনেক দূর। রাস্তা তৈরী আপনা থেকেই বন্ধ হয়েছিল বলেই না শওকত দুর্ভাবনা থেকে মুক্তি পেয়েছিল। আজকে বদনের কথা শুনে আবার নতুন কাকির কথা ভাল করে মনে পড়ল। অন্যমনস্কভাবে বলল, "লিখলেও আসবে না রে। অত সময় তার নেই।"

বদন হতাশভাবে বলল, "তা হলে কি হবে?"

"একটা কাজ করতে পারবি?"

নতুন কোন পথের সন্ধান পাবার আশায় বদন উৎফুল্ল হয়ে বলল, "সব কাজ পারি চাচা, তোমার কথা বেম্মার কথা বলে মানছি।"

শওকত হেসে বলল, "তুই কিছুই পারবি না। তবুও গাঁয়ের দশজনকে বলে আয় দেখি আখ চাষ তারা যেন কেউ না করে। যারা করবে তারা যেন এক ট্যাকার কম দামে আখ না বেচে, পারবি? লোকের রায় নিয়ে আমায় বলে যাস।"

"লোকে শুনবে কি? কাঁচা পয়সা!"

"তাই তো বলছি। শুনে আয় লোকের কথা, তারপর কি করতে হবে সবাই মিলে ঠিক করব।"

বদন কল্কেতে গোটা কতক সুখটান দিয়ে রওনা হল। শওকত যেন রাজ্যের দুর্ভাবনায় পড়ল। ছ' আনা মণে আখ বিক্রির দাসখত লিখে দাদন নিয়ে চাষারা নিজের কপালে নিজে আগুন দিয়েছে, সে আগুন নেবাবে কে? যারা জমি হারাল তারা হল মজুর, যাদের জমি রইল তারা দিল দাদনি খত, গাঁয়ের চাষী কলের চাকায় বাঁধা পড়ল। যারা নগদ পয়সায় জমি বেচল তাদের চোখ খুলতে দেরী হল না, দেরী হল দাদনের দাসখত যারা দিয়েছে তাদের। বাজার দর যতই হোক সেই একমণ ছ' আনা। দেরীতে হলেও বুঝল সবাই কিন্তু ভুল শোধরাবার রাস্তা তখন বন্ধ।

বদন এসে কদিন আগে জানিয়ে গেছে কলের বাবুরা কলের লাঙলে চাষ ধরেছে। শওকত বুঝল ক্ষেত-মজুরদের কাজও বন্ধ হবে এবার। এতদিন যারা ক্ষেতে খেটে খেত তারাও ভয়ঙ্কর পরিণতির দিকে পা

বাড়াল। জমির মালিক হল জমির মজুর, সে মজুরিতেও টান পড়েছে এবার। শওকতের মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল। মজুরের দল ছুটল দালালদের বাড়িতে, জিজ্ঞেস করল "তোমরা কলে কাজ দেবে বলেছিলে এখন সে কাজও তো আর থাকছে না। কাজ দাও।"

তারা মুচকি হেসে বলল, "কাজ দিতেই তো বসে আছি, তোমরা পারছ কই? তোমরা পারছ না বলেই হাজার হাজার টাকা লোকসান দিয়ে হিন্দুস্থানী মজুর আনতে হয়েছে তা বুঝি জান না। আমরা কাজ করতে মানা করেছি কি?"

মানা তারা সত্যিই করে নি, তাদের বদলে কলের লাঙল এসেছে, সে লাঙল চালাতে তো তারা জানে না, সকাল থেকে সাঝ অবধি তেরো আনা মজুরিতে খাটতে খাটতে তাদের দেহই বেচাল হয়ে গেছে, মালিকরা তো জবাব দেয়নি, তারা পারে নি বলেই ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। তবুও তারা মরিয়া হয়ে বলল, "আমরা চাষী আমাদের কাজ দাও ক্ষেতে-খামারে।"

"বড় অফিসে খবর দিচ্ছি, তোমরা অপেক্ষা কর।"

অপেক্ষা তাদের করতেই হয়। করতে বাধ্য হয়। বড় অফিসের খবর আসতে ক' বছর কাটবে কে জানে। তাদের চোখের সামনে ঘড় ঘড় করে কলের লাঙল চলে, হেঁইয়ো-হেঁইয়ো করে হিন্দুস্থানী মজুররা বস্তা বস্তা চিনি টানে আর ফ্যালফ্যাল চেয়ে থাকে সাত গাঁয়ের বোকা চাষীর দল।

শওকতের কানে সব খবর পৌঁছায়, মনে মনে হিসাব নিকাশ করতে করতে সে হাঁপিয়ে ওঠে। গেল, সব গেল, কিন্তু বাঁচাবার উপায় কোথায়, রাস্তা কোথায়? যাদের নিয়ে কাজ করবে, যাদের গরজ, তারাই তার কাছে আসে না, অযাচিতভাবে কি করে সে এগোবে। যা হবার নয় তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কি হবে।

মাঝে মাঝে সে ভাবে কাঁকনমালা যদি থাকত। মেয়েমানুষের যা কলিজার জোর রয়েছে তা অনেক পুরুষের সে দেখেনি। অনেক দিন সেও আসে নি। বদন মন্দ বলে নি, একখানা চিঠি লিখলে কেমন হয়।

সন্ধ্যা বেলায় বদন এসে জানাল খত-খেলাপী কাজ কেউ করতে রাজি নয়, তবে নতুন খত কেউ দেবে না। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাতের এক প্রহর পেরিয়ে গেছে। দাওয়ায় সেই যে বসেছিল এখনও খেয়াল নেই যে কত রাত হল। পরী এসে ডাকতেই সে যেন সম্বিত ফিরে পেল।

"কাম্মু এসেছে একজন ভদ্রলোককে নিয়ে। তোকে ডাকছে।"

কাম্মুর আজ আসবার কথা নয়। সে আসে শনিবারের সন্ধ্যায়। হঠাৎ এল কেন! শওকত কোন কথা না বলে বাইরের উঠোনে এসে দাঁড়াতেই কাম্মুর সঙ্গী ভদ্রলোক সামনে এসে সেলাম দিল।

"আদাব চাচা, কাম্মু ভাইয়ের কাছে আপনার অনেক কথা শুনেছি, দেখা করতে এলাম। কাম্মু তো ভেবেই অস্থির, ইংরেজ চলে যাচ্ছে, বাংলা মুলুক হিন্দুস্থান আর পাকিস্তানে ভাগ হচ্ছে, ও ঠিক করেছে পাকিস্তানেই চলে যাবে। সত্যিই আপনারা চলে যাবেন চাচা!"

শওকত এসব খবর রাখে না। কথাগুলো নতুন নতুন ঠেকছে। সে কি যে জবাব দিবে বুঝেই উঠতে পারল না।

"যাব, এমন কথা বলিনি তো শ্যামদা, তবে যে ভাবে বাংলা জুড়ে লড়াই চলছে তাতে আমাদের গাঁয়ে থাকা সম্ভব হবে কি? তার চেয়ে পাকিস্তানেই চলে যাব মনে করেছি।" কথা শেষ করে কাম্মু শওকতের দিকে জবাব পাবার আশায় চেয়ে রইল।

শ্যামসুন্দর হাসল। বলল, "অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুকায়ে যায়। বুঝলে ভাই, আমরা নিজেকে বড্ড বেশী ভালবাসি, সেই ভালবাসার টানে বাঁচার রাস্তা খুঁজি, খুঁজতে খুঁজতে মরার রাস্তায় আপনা থেকেই পা বাড়িয়ে দেই। সেই মরণটাকে সুন্দর করে নিতে পার না ভাই? যদি মরতেই হয় তা হলে যেন নিজের দেশে সে মরণ হয়। নয় কি?"

কাম্মু জবাব দেবার আগেই শওকত বলল, "ঠিক বলেছ বেটা, তা বলে যশাইয়ের মাটি ছেড়ে একপাও নড়ব না। তার জন্য যদি মরতেও হয় তাতেও রাজি।"

"এই তো হক কথা। দেশ আমরা ছাড়ব না চাচা, সে হিন্দুস্থানই হোক আর পাকিস্তানই হোক। নয় কি?"

"হাঁ বাপ। তা হাত-মুখে পানি দিয়ে নাস্তা করে নাও। তা কি মনে করে এসেছ, কোন কাজ, কিছু খেদমত করতে পারব কি?"

"কাজ! আছে বইকি। পরে বলব চাচা।"

সারা রাত ধরে শ্যামসুন্দর, শওকত আর কাম্মুর কি যেন আলোচনা হল। সকাল বেলায় শ্যামসুন্দরকে আর দেখা গেল না, কিন্তু শওকতকে দেখা গেল গাঁয়ের দরজায় দরজায়।

যাবার সময় শ্যামসুন্দর বলে গেছে, "চাচা ওদের ওপর রাগ করতে নেই, ওরা অবোধ মূর্খ, একবার দু'বার করে হাজারোবার ওদের দরজায় ধর্ণা দিয়ে ওদের শেখাতে হবে, জানতে দিতে হবে, নইলে ওরা বাঁচবে না, ওরা পথ খুঁজে পাবে না।"

শওকত মৃদু আপত্তির সুরে বলল, "দেশ তো ভাগ হয়ে গেল, এখন ওরা অনেকেই এদেশ থেকে চলে যাবে, ওদের কাজে বাধা দিলে ওরা মানবে কেন?"

"ওরা মানতে চাইবে না, কিন্তু মানবে না এ কথা বিশ্বাস করি না। তাড়াতাড়ি করতে গেলে শেষ অবধি সবই পয়মাল হয়ে যাবে। অত্যাচার অবিচারকে ওরা ভগবানের দান বলে মাথায় পেতে নিয়েছে, মাথা উঁচিয়ে প্রতিবাদ করতে ভরসা পায় না, ওদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে তা হলে ভগবানের ইচ্ছাকে অস্বীকার করা হয়। এত বড় অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি সংগ্রহ করবার মত অবস্থা সৃষ্টি করা সহজ নয়, এখানে প্রয়োজন বিরাট ধৈর্যের।"

"কিন্তু আল্লার বদ দোয়া মাথায় পেতে কেন নেবে না ওরা?"

"আল্লা! তা বটে। খুনোখুনি করে ভাই-ভাইয়ে আলাদা হওয়াটাও আল্লার বদ দোয়া। আল্লা যখন বদ নয় তখন তাঁর কাছ থেকে বদ দোয়া আসবে কেন! হাজার হাজার বছর ধরে আল্লার নামে নানা রকম যন্তর তৈরী হয়েছে। আমার যন্ত্রে তুমি পা না দিলে তোমার মাথা কাটবার ব্যবস্থা রয়েছে, তোমার যন্ত্রে আমি পা না

দিলে আমার মাথা কাটবার ব্যবস্থা রয়েছে, কিন্তু আমার-তোমার আল্লা পাবার কোন দরকারই হয়নি কোনদিন, হবেও না কোনদিন। যন্ত্রের চাপে মানুষের দম আটকে আসছে আবহমান কাল, সে কথা কেউ কি অস্বীকার করতে পারে? সেই আল্লার সৃষ্টিকে রক্ষা করবার মত মন যদি তৈরি করতে হয় তা হলে ঐ অবোধ মূর্খদের শেখাতে হবে, জানতে দিতে হবে, তবেই ওরা অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে ভরসা পাবে।"

কথাগুলো শওকতের কানে কানে ফিরছে, সে নিজেও ফিরছে দুয়ারে দুয়ারে। নৌকার হাল ছেড়ে মানুষের হাল ধরতে চলেছে শওকত বেপারি।

নয়

নৌকার হাল ধরা আর মানুষের হাল ধরা এক নয়। এক নৌকার হাল ধরে বাইশজনকে পারাপার করা যায়, কিন্তু বাইশজন লোকের হাল ধরে এক নৌকায় তোলা যায় না। যদিও যায় তার মেহনতের মজুরি পোষায় না। তবুও 'রাগ করা' মানা। গাঁ উজাড় হয়ে শহর বসে, চাষী উজাড় হয়ে মজুর সৃষ্টি হয়, সুখের চালা ভেঙে দুঃখের অট্টালিকা গড়ে ওঠে—সবই শওকতের চোখের সামনে হয়। ক্ষীণ প্রতিবাদ কাঁধে বেয়ে দুয়ারে দুয়ারে শওকত বেপারি ঘুরে বেড়ায়, মানুষের হৃদয়ের কাছে আবেদন জানায়। যান্ত্রিক সভ্যতার চাপে মানুষ বনমানুষে রূপান্তরিত যাতে না হয় সেই উপদেশ দিয়ে গেছে শ্যামসুন্দর। শওকত আর ঘাটে যায় না, দুয়ারে দুয়ারে মানুষের কাছে, মানুষের হৃদয়ের কাছে আবেদন জানিয়ে চলে।

কাশু ঘুরছে পয়সার ধান্দায়, শওকত ঘুরছে মানুষের ধান্দায়, পারঘাটার নৌকা রয়েছে চন্দরের হেপাজতে। সোঁতার পারে ভোঁ বাজলেই চন্দর বের হয় প্রথম খেয়া জমাতে, কলের চাষীদের কলদানবের গহ্বরে ঠেলে দিতে।

চন্দর যাতে জেলে, বিশ্বাসে বোষ্টম। ঠোঁটের ডগায় 'রাধেশ্যাম', আর সব কর্ম 'তাঁরই ইচ্ছায়',—বনেদি বোষ্টম না হলেও আচার-বিচারে বোষ্টমরাজ। 'তাঁরই ইচ্ছায়' নির্ভর করে ভবতরণী বৈতরণীর পারে প্রায় নিয়ে এসেছিল, হঠাৎ মহামুনি পরাশরের মত তারও সাথে দেখা হয়ে গেল হারানীরূপী মৎস্যগন্ধার। অসার সংসারের সার একটু বেশী বয়সে উপলব্ধি করতে পেরে সে যেমন খুশী হয়েছিল তেমনি পয়সার চিন্তায় পারঘাটার ঠিকা পাটনির কাজও নিতে হয়েছিল।

হারানী অন্তবোরেগীর বিধবা, বয়স তিরিশের কম। অন্ত ছিল চন্দরের গুরুভাই। মাঝে মাঝে অন্তর তুলসীতলায় চন্দরকে দেখা যেত একতারা বাজিয়ে নামগান করছে, পদাবলীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করছে। অন্তর বয়স কম হলে কি হবে, সে হল বনেদি বোষ্টম, তার মা-ঠাকুরমা বৃন্দাবনের নীল যমুনায় তীর্থ করে এসেছিল। সেই অন্ত মরল কলেরায়। হারানী কেঁদে নিজেও ভাসল, গাঁয়ের জোয়ান ছেলেদেরও ভাসাল। লোকে বলল, 'অন্তকে করবীর বিচি খাইয়ে মেরে ফেলেছে হারানী বোষ্টমী।' বাজার বসিয়েছে রঙ্গরসের, চোখ জ্বালা করে অনেকেরই যারা তার করুণার আশায় ঘুর ঘুর করে ঘুরেও হালে পানি পায় না। শেষ অবধি হারানী ভাসতে ভাসতে চন্দরের গাঙে এসে নৌকা বাঁধল। না বেঁধে উপায়ও ছিল না। অন্তর বাস্তুতে বসে আর দিন কাটে না। লোকে নানা কথা বলে, জুলুমও করে।

বয়স দু'কুড়ি পেরিয়ে চন্দর 'তাঁরই ইচ্ছায়' বাকী কটা দিন গুজরানের চিন্তা করছিল, এমন সময় হারানী এল আশ্রয় নিতে। বন্ধুর বিধবা, ফেলে দিতে তো পারে না! 'তাঁরই ইচ্ছায়' একদিন কণ্ঠীবদল করে ঘরে তুলল তাকে। হারানী দত্তেবাড়িয়ার মায়া কাটিয়ে ধলাটে উঠে এল, সংসার পেতে বসল।

সংসারের অনেক কিছু অভিজ্ঞতাই চন্দরের ছিল না, সেটুকু পূরণ করে দিল হারানী। এতদিন একতারা বাজিয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে ভিখ

মেগে চন্দরের বেশ দিন কেটেছে, এখন দুটো পেট তাতে চলে না। নতুন ধান্দা কিছু চাই। জেলের ছেলে জাল মেরে খায়নি কখনও, দরকারও হয়নি। হারানী সংসার পেতেছে, সম্ভাবনা রয়েছে অনেক কিছু, বাধ্য হয়েই চন্দরকে পারঘাটার পাটনি হতে হয়েছে, শওকতও খুঁজছিল শক্ত লোক, চন্দরকে পেয়ে পুষিয়ে নিল অনেকটা। শওকত বেপারি লোক চেনে, অকর্মণ্য পরগাছা এই লোকটাকে রুজি রোজগারের পথ খুঁজে দিয়ে শওকত অনেকটা নিশ্চিন্ত হল।

কাজ দেবার আগে শওকত একটু বাজিয়ে নিল চন্দরকে। বলল, "তোর ভীমরতি ধরেছে দেখছি।"

চন্দর যেন এই প্রশ্নের জবাবদিহি করতে এসেছে এমন ভাব দেখিয়ে কষ্টলভ্য হাসিতে মুখখানা ফাঁপিয়ে তুলে বলল, "সত্যি বলেছ চাচা, ভীমরতিই ধরেছে। সারাজীবন নাম করে কেটে গেল, শেষ বয়সে আবার সংসার। আমার কি ইচ্ছে ছিল ছাই, ও যে ছাড়ল না। এখন দেখছি, ছিলুম জোলা গামছা বুনে খেতুম, এখন দায় হয়েছে সর্বে বুনে। হেঁ-হেঁ-হেঁ।"

চন্দর কৃতিত্বপূর্ণ হাসিতে রাঙা হয়ে উঠল।

"তা তো বুঝলাম, কিন্তু খাবি কি, খাওয়াবি কি? কলে কাজ নিবি না কি?"

"কল!" চন্দর যেন আকাশ থেকে পড়ল। অবাক হয়ে বলল, "কলে কি মানুষ কাজ করে চাচা! তার ওপর বোষ্টম আমি, কল কি আমার সয়। কলের কাজে মানুষ কলের মানুষ হয়, ঘেন্নাপিত্তি তাদের নষ্ট হয়ে যায়। অমন কলের মুখে ঝাঁটা। ক'দিন থেকে বউ বলছিল, তুমি যদি একটু ঘেন্নাপিত্তি কর তা হলে তোমার ডিঙি বেয়ে পেটের ভাত এসে যেত।"

"পারবি তো?"

"নিশ্চয় পারব", উৎসাহের সাথে চন্দর বলল।

"দশ আনা ছ'আনায় রাজি?"

চন্দর অতোটা ভাবেও নি। সে ভেবেছিল চার আনা বারো আনায় রফা হবে। দশ আনা তার অংশ, বলে কি শঙ্কত!

চন্দর রাজি হয়ে বাড়ি ফিরল।

মুখে 'রাধেশ্যাম' গলায় তুলসীর মালা, গলুই-এ বসে চন্দর মাঝি। সাত সকালে পারঘাটায় আসে আর সূর্য যখন যশাইয়ের ঝোপে মুখ লুকোয় তখন সে বাড়ি ফেরে। অবসর সময়ে গুণগুণ করে পদাবলী গান করে। সন্ধ্যায় হাত পা ধুয়ে দাওয়াতে বসে শুকনো নেশায় টান দিয়ে একতারা বাজিয়ে একমনে গেয়ে চলে দোহা-পদাবলী। হারানী পিদিম নিবিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে, অনেক রাতে তার ঘুম ভাঙিয়ে চন্দর খেতে বসে। হারানী পাশে বসে খাওয়ায়, নিজেও খায়, গ্রাস মুখে তুলে দেয় চন্দর নিজের হাতে।

পারের কড়ি পাইয়ে-পাইয়ে হিসাব মিলিয়ে দিয়ে আসে রোজই। পুরানো দিনের চন্দর হারানীর খাঁচায় নতুন পড়া শিখছে কিছুকাল থেকে। পুরানোর তলা দিয়ে নতুন চন্দরের চেহারাটা ধীরে ধীরে ফুটে উঠতে লাগল কারিগর হারানীর নিখুঁত শিল্প সাধনায়।

হারানী চালাক মেয়ে। অন্তকে পথে বসিয়ে সে বিধবা হয়েছে। অন্তর ভাল হল, কপাল পুড়ল চন্দরের। সিকি আধুলিটা উপরি না পেলে হারানীর মন ওঠে না। তার বায়না শুনতে শুনতে চন্দর হয়রান হয়ে যাচ্ছে। পুরুষের পৌরুষ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, পথ না পেয়ে ভাগের কড়িতে হাত দিল, শুরু হল ফক্কাবাজি। ফাউ আনতে মন সরত না কিন্তু হারানী নাছোড়বান্দা, সে বুঝিয়ে দিল হক পয়সা তার, শঙ্কত কাজ না করে অত পয়সা পেতেই পারে না। হারানীর মুখের যুক্তির চেয়ে কটা চোখের বঙ্কিম চাহনির যুক্তি অকাট্য। চন্দরের ভাগ বাড়তে থাকে।

শঙ্কত যে না বুঝল এমন নয়। চন্দরকে দূর করে দিলে সেই বা কি খাবে! অভাব তার বৃদ্ধি পেয়েছে, স্বভাবও তাই বদলে গেছে। চন্দরের ওপর সে রাগ করতে পারে না, তবুও একদিন নেহাত বলেই ফেলল, "ঘাটের কড়ির হিসাব ঠিক রাখিস তো চন্দর?"

আচমকা কথাটা শুনে চন্দরের মুখের রক্ত সাদা হয়ে গেল। আমতা আমতা করে বলল, "কি কও চাচা, হিসেব সে আমি ঠিক রেখেছি। বাজার একটু ঢিলা পড়েছে চাচা ?"

"তাই তো ভাবনা। একে বাজার ঢিলে তার ওপর তুই হলি বোরেগী বোষ্টম মানুষ, পয়সা নিতে ভুল করিস না তো ?"

কথাটা কঠিন নয়, না হলেও অর্থটা খুবই গূঢ়। চন্দর যে না বোঝে এমন নয়। ঘাটের কড়ি বেড়েছে বই কমেনি। আজকাল কলের ভোঁ বাজলেই ওপারের চাষীরা সব খুইয়ে মজুরি পাবার আশায় কলের হাতায় দৌড়ে চলে, রোজ বিহানে পাখি ডাকার সাথে সাথে তাদের ছুটতে হয়, একথা চন্দর যেমন বোঝে শওকতও তেমনি বোঝে। তাই হিসাবের কড়ি কম-বেশী বুঝতে কারুরই কষ্ট হয় না।

শওকত চলে যেতেই চন্দর মহা ভাবনায় পড়ে গেল। বিশ্বাস এমন একটা অদৃশ্য বস্তু যাকে আশ্রয় করে মানুষ পরাভোগের হাত থেকে রেহাই পায়, অবিশ্বাসের কণা সাজান ঘরে আগুন জ্বালায়। চন্দর যে ইচ্ছে করে আধুলি সিকি আলাদা করে হিসাব দেয় এমন নয়, নতুন গাঁয়ের মোহান্তের আখড়ায় বেগুনি রং-এর শাড়ি দেখে এসে অবধি হারানী বায়না ধরেছিল, দামও সামান্য। এগারো টাকা চৌদ্দ আনা। পুরুষ মানুষ যদি পরিবারের একটা বায়না রাখতে না পারে তা হলে ইজ্জত থাকে না, পরিবার নিয়ে সংসার করাও ঝকমারি। সামান্য টাকা তার ওপর হারানীর শাণিত যুক্তি, চন্দর খেই না পেয়ে উপকারীর গলায় ধীরে ধীরে ছুরি চালাতে শুরু করেছিল। চন্দর হিসাবী লোক। হিসেব করে মাস কাবারে সতের টাকার বেশী কোন দিনই পায়নি, তাই নীচের তলায় মাটি কাটতে আরম্ভ করল। অবশ্য নিজের বুদ্ধিতে সবটা নয়, হারানীই তার পথপ্রদর্শক। চার আট আনা পয়সা এমন কিছু নয়, হিসাব করে হাত চালালে মাসে দশ পনেরো বেশী আসবেই আসবে। হাত চালানর প্রথম মাসে নীচ তলা থেকে তের টাকা দশ আনা আর

ভাগের এগারো টাকা সাত আনা পেয়ে চন্দর বুঝতে পারল এতদিন সে নেহাতই ঠকে এসেছে। কোথায় সতেরো টাকা আর কোথায় পঁচিশ টাকা, একেই বলে স্ত্রীভাগ্যে ধন। প্রথম প্রথম চন্দরের মনে খোঁচা দিত, তারপর নির্বিকার ভাবে রোজকার হিসাব দিয়ে চন্দর ঘরে ফিরে আসে উপরি পয়সা ট্যাঁকে গুঁজে।

নতুন বেগুনী রং-এর শাড়িতে হারানীকে মানিয়েছে ভাল। চন্দরের বয়স একটু বেশী, তা বলে হারানী শখ-শৌখীনতা করবে না কেন। হারানীর নিটোল স্বাস্থ্য, মটরের ডালের মত রং, বেগুনি শাড়ির আচ্ছাদনে চোখ ঝলসে দেয়। তাকিয়ে তাকিয়ে চন্দরের আর মন ওঠে না। কেরোসিন তেলের কুপি জ্বেলে চন্দর আনমনে একতারায় ঘা দেয়, হারানী তার গলায় গলা মিলিয়ে গান ধরে। চন্দর সারাদিনের মেহনত আর বেইমানি ভুলে যায়।

সারাদিন চন্দর বাইরে থাকে, হারানী থাকে একা। একাই ছিল এতদিন। সেদিন পটলা ঘাটে এসে চন্দরকে বলল, "তোমার ঘরে কুটুম এয়েছে গো!"

কুটুম! হারানীর সাতকুলে কেউ নেই, তার নিজেরও নেই। কুটুম আসবে কোথা থেকে! সন্ধ্যার সময় ফিরে এসে হারানীকে জিজ্ঞেস করল, "আজ কে এসেছিল?"

"আমাদের দক্ষের বর, চেন না বুঝি? তালপুরের মাসি, তার মেয়ে।"

চন্দর জিজ্ঞেস করে কথা বাড়ায় না, শুধু বলল, "বেশ, বেশ। তা চলে গেল কেন, দু' একদিন না হয় থাকত।"

"কালই আসবে। দক্ষকে আনতে গেছে।"

সেদিন শওকতের মিষ্টি মাখা ধারাল কথাগুলো তার কলিজায় বিঁধেছিল ভালই। মন খারাপ হওয়ারই কথা। চন্দর ঘরে ফিরে দেখল হারানী তখনও রান্না করেনি।

দাওয়ায় উঠে ডাকল, "কৈগো, কোথায় তুমি?"

হারানীর বদলে অন্যের গলা শোনা গেল, "ঐ তোর নদের নিমাই এসেছে রে হারানী।'

হারানী খিল খিল করে হেসে উঠল। গুটি গুটি চন্দর এসে রান্না ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভেতরে উঁকি দিল।

হারানী সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "কাল যে বলেছিলুম দক্ষ আসবে, দক্ষ এসেছে, তোমার কুটুমও এসেছে। আজকের মত আটকেছি।" দক্ষকে উদ্দেশ করে বলল, "গরীব দিদির বাড়ি যখন এসেছিস তখন দু'একদিন থেকে যেতে হবে। যা পেন্নাম কর গোঁসাইকে।"

প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল দক্ষময়ী। শ্যামবর্ণ, নাকে রসকলি, গলায় তুলসীর মালা, বয়স হবে বিশ বাইশ।

চন্দর বুঝল বাবুদের ঘরে বউ এলে যৌতুক আসে সাথে সাথে, তার বউ-এর সাথেও যৌতুক এল, এই প্রথম যৌতুক। সাথে সাথে না এসে দেরীতে এসেছে এটাই ভাগ্যি। চন্দর হাসল।

"পেন্নাম করলাম, আশীর্বাদ করলে না গোঁসাই।"

"আমি কি আশীর্বাদ করবার কর্তা, 'তাঁর ইচ্ছাই' ইচ্ছা, 'তাঁর আশীর্বাদ' তিনিই করবেন।" হারানীকে লক্ষ্য করে বলল, "একটা দরকারী কথা।"

ঝঙ্কার দিয়ে হারানী বলল, "সে পরে হবে।"

"সারা রাত তো পড়েই রয়েছে গোঁসাই, এত তাড়াতাড়ি দরকারী কথা শেষ হলে রাত কাটবে কি!"

দক্ষের নির্লজ্জতায় চন্দর মোটেই খুশী হল না। দক্ষকে কোন জবাব না দিয়ে হারানীকে লক্ষ্য করে বলল, "খুবই দরকারী কিনা!"

অনিচ্ছাসত্ত্বেও হারানী উনুনে কাঠ ঠেলে দিয়ে উঠল। উঠোনে এসে চন্দর বলল, "শওকত চাচা সন্দেহ করেছে।"

সন্দেহ যে জাগবে সে কথা হারানী খুব ভালই জানে। অন্ত বোরেগীর ভিটেয় ঘুঘু চড়িয়ে সে এসেছে, এমন অবস্থা সামলাবার মত প্রস্তুতি তার ছিল, তবুও জিজ্ঞেস করল, "কি বলল?"

"বলেনি কিছু, মুখোমুখি বলবেও না কিছু, আঁচ দিয়েছে শুধু।"

"আঁচে গা পুড়ে গেল! আহা, মোমের পুতুল! ওর ব্যবস্থা আমি করব।" বলেই হারানী রান্নাঘরের দিকে পা বাড়াল। সাথে সাথে চন্দর তার শাড়ির আঁচল চেপে ধরল।

"ছাড়। বয়স বাড়লেই বুদ্ধি বাড়ে কি? পরিবার নিয়ে ঘর করবে, পয়সা থাকবে না তা কি হতে পাবে? পয়সা না থাকে পরিবার ছাড়। পরিবার না ছাড়লে পয়সা আন। কি ভাবে আনবে তাও কি বলে দিতে হবে?"

খাওয়া দাওয়ার পর হারানী জানাল দক্ষের স্বামী মথুর তখুনি ফিরে যাবে তার গাঁয়ে। দু'একদিন পরে এসে দক্ষকে নিয়ে যাবে।

চন্দর আপত্তি করেছিল, দক্ষকে দিয়ে বলিয়েছিল, মথুর তা শোনেনি। খাওয়া দাওয়া সেরেই সে পথ ধরল। নেহাত হারানীর অনুরোধে দক্ষকে রেখে গেল।

একখানা ঘর। মেঝেতে দক্ষের বিছানা পেতে দিয়ে হারানী চাটাই পেতে নিল চৌকির ওপর, চন্দরও বারান্দায় রাত কাটাবার মতলবে চাটাই পেতে নিল। দক্ষ ঘুমিয়ে পড়তেই হারানী বারান্দায় এসে ডাকল, "গোঁসাই, ঘুমলে নাকি?"

চন্দরের চোখে ঘুম ছিল না। শওকতের কথাগুলো তার মনে তখনও কাঁটার মত বিঁধছিল। হারানী ডাকতে সাড়া দিল।

"ঠিক করলে কিছু?"

চন্দর হারানীর কথা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, "কিসের?"

চাটাইয়ে ভাল করে বসে হারানী বলল, "সেই তোমার শওকতের বিষয়।"

"শওকত চাচা যখন সন্দেহ করেছে তখন সামাল হতেই হবে। নইলে পারঘাটার কাজ বন্ধ হতে কতক্ষণ। ওটা না থাকলে অন্য কাজ পাব কোথায়? সেই তো কলের কাজ, ও পারব না।"

হারানী চুপ করেই বসে রইল।

"তুমি কি বল?"

"বলবার আর কি আছে, নি-মুরোদি মরদের পরিবার নিয়ে ঘর করা উচিত নয়।"

চন্দর এসব শুনতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, প্রতিবাদের সুরে বলল, "জেনে শুনেই তো এসেছ। মুরদ থাকলে কণ্ঠীবদল না করে বিয়ে করে আনতুম।"

কথাটা বলা উচিত হয়নি জেনেও চন্দর বলবার প্রলোভন ত্যাগ করতে পারেনি। হারানী কাটা কৈ-মাছের মত তিড়বিড়িয়ে উঠল। বলল, "তোমার মত মরদের ঘর করার চেয়ে গলায় দড়ি দেওয়া ভাল।"

"ভাল যখন, তখন দাও না কেন?" নীতিজ্ঞান চন্দরের তখন টনটনে হয়ে উঠেছে, সে বলল, "চুরি করে পরিবার পোষার চেয়ে পরিবার না থাকাই ভাল।"

হারানীও তাই চায়। মনের মত পুরুষ পাচ্ছে না বলেই না চুপ করে বসে আছে। হারানীর ঘর করার দিন ফুরিয়ে এসেছে, উড়তি পাখি নতুন বাসা খুঁজছে।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে হারানী উঠে গেল।

সকালে ঘুম ভাঙতেই চন্দর দেখল দরজা খোলা। সে চোখ ডল্‌তে ডল্‌তে ভেতরে এসে থমকে দাঁড়াল। হারানী বিছানায় নেই, সেখানে শুয়ে আছে দক্ষ। সকালের মিঠে বাতাসে অঘোরে সে ঘুমচ্ছে। ঘুমের ঘোরে গায়ের কাপড় সরে গেছে। অর্দ্ধনগ্নদেহে উৎফুল্ল যৌবনরেখা নিঃশ্বাসের সাথে কেঁপে কেঁপে উঠছে। পলকের দৃষ্টিতে কেঁপে উঠল চন্দরের হৃৎপিণ্ড। চন্দরের মাথা বোঁ-বোঁ করে উঠল। মুখ ঘুরিয়ে বারান্দায় এসে হারানীকে চীৎকার করে ডাকল। চন্দরের গলার শব্দে দক্ষ লাফ দিয়ে উঠে কাপড় সামলে নিল। সলজ্জতার রাঙা আলতায় তার শ্যাম মুখখানা রাঙিয়ে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

হারানী আসতেই চন্দর বলল, "সকাল বেলায় আমায় ডেকে দাওনি কেন?"

না ডাকায় কোন অপরাধ হতে পারে একথা হারানী বিশ্বাস করে না। অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চন্দরের দিকে চেয়ে থেকে কোন জবাব না দিয়েই হারানী ফিরে গেল।

চন্দর গাড়ু হাতে বেরিয়ে পড়ল। ঘাটে যাবার সময় হয়ে গেছে।

দক্ষ পথে দাঁড়িয়ে তারই অপেক্ষা করছিল। চন্দরের পথ আগলে দাঁড়াল। সেই সকালের দক্ষ, যার অবিন্যস্ত রূপসম্ভার উন্মাদনার আবেশ সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। সকালের সেই রক্তাভ শ্যাম তখনও বিচ্ছুরিত হচ্ছিল তার কপোলে অধরে।

"মেয়েদের লজ্জার কথা অপরকে ডেকে কেউ শোনায় নাকি গোঁসাই?" দক্ষ তীক্ষ্ণভাবে জিজ্ঞেস করল।

চন্দর থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

"কাল রাতে তোমাদের ঝগড়া শুনেছি গোঁসাই। নদীর চড়ায় ঘর বাঁধলে সে ঘর থাকে না। বুঝলে গোঁসাই।"

চন্দর সত্যিই কিছু বুঝতে পারেনি। তীক্ষ্ণতার সাথে ব্যঙ্গের সংমিশ্রণ তার মনে আলোড়ন সৃষ্টি করল। জবাবদিহী করবার আগেই জবাব যেন পেয়ে গেল। তবুও চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

"কি ভাবছ?"

"বুঝলাম না তোমার কথা।"

"অন্ত বোরেগী কি করে মরেছে জান? সেঁকোর বিষে। তুমিও কি তাই চাও? হারানী ঘর করবার বোষ্টমী নয়, তা হলে অন্ত মরত না, মরেছে হারানীর পয়সার খাঁকতি মেটাতে না পেরে।"

চন্দর কোন জবাব না দিয়ে সোজা এসে গাড়ু রেখে গামছা কাঁধে ফেলে বেরিয়ে গেল।

বিকেলে এসে দেখল মথুর ফেরেনি, দক্ষেরও যাওয়া হয়নি।

অনেক দিন পর আজ সে একতারা নিয়ে বসল। হারানী তখন রান্নাঘরে, দক্ষ তার সাথে জমিয়ে গল্প করছে। একাই দাওয়ায় বসে টুং-টাং করতে করতে পদাবলীতে সুর দিল।

দক্ষ পেছন থেকে এসে বলল, "তোমার গলা তো ভারি মিষ্টি।" কথাটা বলেই দক্ষ হাসল, সে হাসিতে প্রাণ নেই, রয়েছে কি যেন একটা কান্নার ঝিলিক।

সুন্দর! আজ অবধি কেউ তার গানের প্রশংসা করেনি। প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, "তোমার মুখে নতুন কথা শুনলাম, একথা আজও কেউ বলেনি।"

"যারা বলেনি তারা তোমার গান শোনেনি, তারা আওয়াজ শোনে, আওয়াজের তলায় যে প্রাণ থাকে সেটা দেখবার মত চোখ আর শুনবার মত কান তাদের নেই। একটা বিদ্যাপতি গাও গোঁসাই।"

"বিদ্যাপতি! মথুর নেই তাই বিরহ জেগেছে বুঝি!" চন্দর হাসল।

"মথুর!" দক্ষ আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল।

"তোমার নিজের ঘরের লোক তাকে চেন না।"

"ঐ বিটলের কথা বলছ, ও আমার কোন্ সোয়ামি! পাশের বাড়ির পিতিবাসী বাপের বাড়ি পৌঁছে দিতে এসেছিল, পথে হারানী দিদির সাথে দেখা, তাই রেখে দিয়ে সে নিজের কাজে চলে গেছে।"

"তা হলে—"

"তা হলে যা শুনেছ তা নয়।"

চন্দর চুপ করে রইল, একতারাটা অসাড় হাত থেকে চাটাইয়ের ওপর গড়িয়ে পড়ল। এমন নগ্ন সত্যকথা সে বোধ হয় শোনেনি কখনও, তাই অবাক হয়ে গিয়েছিল।

"থামলে কেন, গাও।"

"হাঁ, গাইছি।" বলে চন্দর আবার একতারাটা তুলে নিল। বলল, "তুমিও গাও।"

"গাইতে এখন ভুলে গেছি।"

"শ্যামের গান কেউ ভুলে না, তুমিও ভুলনি। নাও, ধর।"

"অভ্যেস নেই।"

"নাইবা থাকল, পুরানো অভ্যেসটা একটু ঝালিয়ে নাও।"

দক্ষ জবাব না দিয়ে সিঁড়িতে পা দিল। চন্দরের কি যেন হয়ে গেল। আচমকা দক্ষের হাত ধরে বলল, "যাচ্ছ কোথায় ?" চাপা সুরে দক্ষ অনুযোগ করল, "ছিঃ।"

লজ্জায় চন্দর মাটির সাথে মিশে গেল। দক্ষ কিন্তু ঝটকা দিয়ে হাত খুলে নিল না, চন্দরের অবশ হাত থেকে তার হাত আপনা থেকেই খসে গেল।

চন্দর ভূতে-পাওয়ার মত বসেছিল। দক্ষ রান্না ঘর ঘুরে এসে জিজ্ঞেস করল, "কিগো গোঁসাই আকাশের তারা গুনছ নাকি ? গান বন্ধ করলে কেন ?"

চন্দর তার কথার জবাব না দিয়ে উল্টে বলল, "তোমার দিদি কোথায় ?"

দক্ষ হেসে বলল, "সে তো সরকার-বাড়ি গেল। মানা করলুম এই রাতের আঁধারে যেও না, সে শুনল না। ধান না আনলে নাকি কাল পেটে দানা পড়বে না। ভালোই হয়েছে বাপু, একজন ঘোর সংসারী আরেকজন ঘোর বিবাগী। কাণ্ডজ্ঞানও নেই।"

শেষের কথাটা কোথায় পোঁছাবে তা দক্ষও জানে। যেখানে পোঁছাল সেখানেও দুরু দুরু কাঁপুনি শুরু হল।

চন্দর জোর করেই বলল, "মাপ কর দক্ষ, ভুল হয়ে গেছে।"

দক্ষ শুধু হাসল। বলল, "হাত জোড় কর, বল আর কখনও কোন মেয়ের হাত ধরবে না।" চন্দর হাত জোড় করতেই দক্ষ হো হো করে হেসে ফেলল, বলল, "ও মা! সত্যি সত্যি তুমি হাত জোড় করছ, তোমার মত বোকা কখনও দেখিনি। মেয়েদের কাছে হাত জোড় করে থাকলে অন্তু বোরেগীর মত সেঁকোর বিষে মরতে হয়, বুঝলে গোঁসাই।"

দক্ষ ধপ করে চন্দরের পাশে বসে একতারাটা তার হাতে তুলে দিয়ে বলল, "বাজাও, আমি গাইছি।"

চন্দর বিশ্বাস করতে পারল না। কানের কাছে মুখ এনে দক্ষ ফিসফিস করে বলল, "বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি ?"

"হয়েও হচ্ছে না।"

"তা বটে। বাজাও।"

একতারার কান মুচড়ে চন্দর সুর দিল তাতে। দক্ষও সুরের সাথে গলা মিলিয়ে দিল।

"হরি গেঁও মধুপুর হম্ কুলবালা,
বিপথে পড়িল যৈছে মালতী মালা।"

চন্দর অবাক হয়ে শুনছিল। গান শেষ হতেই বলল, "তোমার সাথে বাজিয়ে সুখ আছে।"

"তার বেশী এগিও না গোঁসাই। বাজনার পর নাচ, নাচের পর গান। মোহান্তের আখড়ায় সেবাদাসীদের দেখনি বুঝি ? তারপর—"

চন্দর লজ্জায় যেন মাটির সাথে মিশে গেল।

দক্ষ হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠল।

"শোন গোঁসাই, বিদ্যাপতিই বলেছেন, 'সুজনক কুদিন দিবস দু' চারি।'—ভুল না যেন।"

দশ

অনেক রাত অবধি দুজনে বারান্দায় বসে হারানীর প্রত্যাগমন প্রত্যাশা করছিল। নিশুতি নেমে এল অথচ হারানী ফিরল না। চন্দর বলল, "তুমি বস দক্ষ, একবার সরকার-বাড়ির আঙনা ঘুরে আসি। রাত তো অনেক হল, তার আসবার নাম নেই, গল্পে বসে গেছে।"

দক্ষ কোন জবাব না দিয়ে রান্না ঘরে গেল। চন্দরও লণ্ঠনের জোগাড় করে উঠোনে পা দিল।

"কোথায় যাচ্ছ গোঁসাই ?"

"সরকার-বাড়ি।"

"আর যেতে হবে না, খেয়ে দেয়ে নাও। আসবার হলে সে আসবেই।"

"মানে !"

দক্ষ ফিক করে হেসে ফেলল।

"তুমি কি চোখ কান বুঁজে থাক না কি গোঁসাই। তা থাক বই কি। সারাদিন থাক পারঘাটায়, বাড়িতে নদের নিমাই এসে এসে ফিরে যায় সে খবর কি রাখ তুমি ?"

"মানে !"

"আবার মানে ! আমি কি পাঠশালার পণ্ডিত যে কথায় কথায় মানে বোঝাব। তোমার ঘরে কে আসে না আসে সে খবর তুমি রাখ না, আমি ভিন গাঁয়ে তার কতটা খবর পেয়ে থাকি।"

চন্দর চমকে উঠল, ব্যস্ত হয়ে বলল, "কি খবর, কে আসে ?"

"ঠাট্টা নয় গোঁসাই, ঠাট্টা নয়। হাকিমপুরের বোষ্টমদের ঘরে মধু বোষ্টমের বড়ই সুনাম। জোয়ান ছেলে, পয়সা আছে, গণ্ডাখানেক সেবাদাসীও আছে তার আখড়ায়। তাতেও তার মন ওঠেনা। হারানী তার নজরে পড়েছে, এবার সোয়াগণ্ডা হল।"

গত রাতের কথা চন্দরের মনে একে একে ভেসে উঠতে লাগল। তবুও অবিশ্বাসের সাথে বলল, "মিথ্যে কথা।"

"তা বই কি। পুরুষ মানুষ হয়ে চুরি করে পরিবার পালতে পার না, তুমি করবে হারানীর সাথে ঘর। একেই বলে গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল। হারানী বাঁচতে এসেছিল গাঁয়ের জুলুম থেকে, সে পয়সার গন্ধ পেয়েছে, এবার পালিয়েছে, আর সে আসবে না।"

"তুমি তা হলে জানতে ?"

"জানতুম না, আন্দাজ করেছিলুম। আজ সারাদিন মধুর সাথে দোর বন্ধ করে ফিসফিসানি শুনেই মনে হয়েছিল। এত তাড়াতাড়ি যে কিছু ঘটবে তা ভাবতে পারিনি।"

"যদি বলতে তা হলে ধরতে পারতুম।"

"পাখি ধরলেই কি পোষ মানে? পোষমানা পাখির জাত আলাদা। বেরথা চেষ্টা করে কি হবে গোঁসাই। তার চেয়ে খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়। কাল সকালে আমিও যাচ্ছি। এবার নিশ্চিন্ত হয়ে একতারা নিয়ে গান গাইতে পারবে।"

চন্দর গুম হয়ে বসে রইল। হারানীর জন্য তাকে নীচতলার মাটি কাটতে হয়েছে, হারানীকে সুখে রাখবে বলেই ভিক্ষে ছেড়ে ঘাটের পাটনী হয়েছে, সেই হারানী না বলে কয়ে পালাবে একথা বিশ্বাস করতে পারছিল না। মেয়েমানুষ, তার বুকে দয়া মায়া নেই! চন্দর নিজেকে প্রবোধ দেবার মত ভাষা খুঁজে পেল না। দক্ষের মানা সত্ত্বেও সে লণ্ঠন হাতে বেরিয়ে পড়ল সরকার-বাড়ির উদ্দেশ্যে।

অনেক রাতে মুখ কালো করে চন্দর ফিরে এল। দক্ষ তখনও বারান্দায় অন্ধকারে বসেছিল। চন্দরকে আসতে দেখে জিজ্ঞেস করল, "কি হল গোঁসাই?"

"পেলুম না।" বলে চন্দর লণ্ঠনটা নিবিয়ে দাওয়ায় বসে পড়ল। দক্ষ জিজ্ঞেস করল, "কি ভাবছ?"

"ভাবছি তুমি যাওনি কেন?"

"আমারও যাবার কথা ছিল, থেকে গেলুম, কাল যাব। তোমার গলায় শ্যাম নাম আরও একবার না শুনে যাব না।"

চন্দর যে দক্ষের কথা বুঝতে পারল এমন নয়, তবুও কেমন মাদকতা অনুভব করল। জিজ্ঞেস করল, "তোমার মেয়াদ তো ক'ঘণ্টা?"

"মনের মত ঘর না হলে মেয়াদ কম হয় বই কি? হারানীই বা কেন মেয়াদ কমাল।"

"ঘর তোমাদের কোন দিনই হবে না। মনের মত ঘর তৈরি করতে হয়। আশমান থেকে সে ঘর পয়দা হয় না।"

দক্ষ অন্ধকারে আঁট সাট হয়ে বসে রইল।

চন্দর জিজ্ঞেস করল, "পুকুরে খোলামকুচি ছুড়লেও ঢেউ ওঠে, না দক্ষ? কতক্ষণ? আবার যে-কে সেই, তবুও যা ক্ষণের তা মনের না হলেও ক্ষণকে মুহূর্তের তরেও স্মরণ করতে হয়। হারানী চিরকাল হারানীই থেকে যাবে। খুঁজে কেউ পাবে না। এখন ভয় হচ্ছে তুমি দক্ষ, কখন বা দক্ষযজ্ঞ বাধিয়ে তোল।"

হারানীর চলে যাওয়াটা দক্ষের কাছে কোন মূল্যবান ঘটনা নয়। বোরেগী বোষ্টমের ঘরে অনেক সময়ই এরকম হয়ে থাকে। সাজের বোষ্টমি যারা তারা কখন কাউকে ভালবেসেছে কি! ভালবাসার বাঁধনে যৌবন তাদের থিতিয়ে যেতে দেয় না কখনও। তারা ঘর বাঁধে ভোগের, ভোগের পরিসমাপ্তি যখন আসে তখন মাড়াইকলের আখের ছিবড়ের মত ছড়িয়ে পড়ে পথে ঘাটে। তার পূর্ব অবধি পথ খোঁজে, ঘর খোঁজে না। রূপ-রুচির কোন হাঙ্গামা তারা পোহায় না। দক্ষ পাকা বোষ্টমি, ঘর সে বাঁধেনি, তবুও চন্দরের মৌন দুঃখে সেও কেমন মুষড়ে পড়ল। চন্দর বিবাগী, সে জানে না বোরেগী হলেও বৈরাগ্য নিয়ে সংসারে কেউ বাস করে না। চন্দর মনে করে বোরেগীব ভেতর বাহির সমান হবে, তা কি হয় কখনও? ভোগের বেসাতিকে জয় করে সংসারের সার যারা খোঁজে বৈরাগ্যের মাঝদিয়ে, এমন ধারা আহাম্মুককে দক্ষের সহ্য হয় না, তবুও চন্দরের দুঃখকে সে যেন সবটা অনুভূতি দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করছিল।

চন্দর উদাসভাবে বলল, "ভালই হয়েছে, 'তাঁর ইচ্ছা' নয় যে সংসারে জড়িয়ে পড়ি, তাই বেঁচে গেলুম। চল দুটো খেতে দেবে, রাত অর্ধেক হয়ে গেল।"

পিঁড়ি পেতে ভাতের থালা সামনে রেখে দক্ষ বারান্দায় চন্দরের বিছানা করে দিল। খেয়ে উঠে বিছানায় বসে চন্দর কেমন উদাস হয়ে গেল।

দক্ষ খাওয়া দাওয়া মিটিয়ে দরজা ভেজিয়ে শুয়ে পড়ল। অনেক রাত অবধি বসে থেকে চন্দর শুয়ে পড়ল। আকাশপাতাল নানা চিন্তায় চন্দর নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলল। শেষ রাতে দক্ষ বাইরে বেরিয়ে দেখে চন্দর এপাশ ওপাশ করছে।

"গোঁসাইর কি শয্যাকণ্টক হল?"

"অনেকটা।"

"চোখে মুখে জল দিয়ে শুয়ে পড়। পিত্তির জ্বালা হয়েছে।"

গাড়ু গামছা এগিয়ে দিয়ে দক্ষ অন্ধকারে উঠোনে নেমে গেল। চন্দর বারান্দায় বসে বসে হাতমুখ ধুয়ে আবার শুয়ে পড়ল।

দক্ষ ফিরে এসে জিজ্ঞেস করল, "বাতাস দেব কি ?"

"না। তুমি শোও গিয়ে। সকাল বেলায় তোমায় আবার যেতে হবে।"

দক্ষ খুঁটিতে ঠেস দিয়ে কি যেন ভাবল। অন্ধকারে তার মুখের চেহারা দেখা গেল না কিন্তু গলার শব্দে চন্দর চমকে উঠল।

"যদি না যাই।"

"না গেলে যেতে বলব না, কিন্তু যাবার জন্যই তো তোমরা আস।"

"ঠিক বিবাগীর মত কথা হল না গোঁসাই, ঘোর সংসারীর মত কথা বলছ।"

"সংসার না করেও অনেকে সংসারী হয় দক্ষ। চার পাঁচ মাস হারানীর সাথে ঘর করে অনেক কিছু শিখে ফেলেছি। এখন বুঝছি, পৃথিবীতে অনেক কিছু জানবার বাকি রয়েছে, সেটা ধীরে ধীরে পূরণ করতে হবে।"

চন্দরের কথায় কোন জবাব না দিয়ে নিঃশব্দে দক্ষ ভেতরে চলে গেল। শাড়ির খস্‌খসানির শব্দে চন্দর বুঝল দক্ষ ভেতরে গেছে, সেও হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

সকাল বেলায় ঘুমন্ত চোখে পারঘাটায় এসে চন্দর সবে বৈঠা হাতে তুলেছে এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে পটলা এসে দাঁড়াল।

"হয়ে গেছে বাবাজি।"

অবাক হয়ে চন্দর তার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

"তাকিয়ে দেখছ কি, এটা এখন হিঁদুর দেশ, আর পদ্মার ওপারটা মোছলমানদের। হিঁদুরা দলে দলে এদেশে আসছে আর মোছলমানেরা যাচ্ছে নদীর ওপারে।"

চন্দর ছুনিয়ার কোন খবরই রাখে না। সে উৎসুক ভাবে নতুন সমাচারটা ভাল করে জানবার জন্য জিজ্ঞেস করল, "তা হলে ?"

"তা হলে সব মিঞাকে হাঁটতে হবে। সরকারী হুকুম এয়েছে।'"

খবরটা দিয়ে পটলা ছুটল। তার এলাকায় ঢোল সহরত করতে হবে। চন্দর কিছু না বুঝে চুপ করেই ছিল। হঠাৎ মনে হল শওকতকে জিজ্ঞেস করে এলে কেমন হয়।

শওকতের উঠোনে এসে দেখে গাঁয়ের সব মুসলমান বসে কি যেন সলা-পরামর্শ করছে। তাকে দেখে সবাই চুপ করে গেল, কি যেন ভীতির ছাপ তাদের মুখে চোখে।

"চন্দর ডাকল, চাচা!"

শওকত জিজ্ঞেস করল, "কেন?"

"পটলা একটা খবর দিয়ে গেল।"

শওকতও সে সংবাদ রাখে। সাথে সাথেই বলল, "মোছলমানরা এদেশে থাকবে না, তোরা কি তাই চাস! আমরা সবাই চলে গেলে তোরা বুঝি খুশী হোস্!"

"আমি তা বলছি না, জিজ্ঞেস করছি এসব কি সত্যি!"

"সত্যি বই কি। কিন্তু চন্দর আমরা এদেশ থেকে যাব না। যতদিন যশাই রইবে আমরাও রইব, তাতে জান কবুল, মান কবুল, কদম হটাব না। তোরা কি বলিস মোকশেদ?"

যারা এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল তারাও মাথা নেড়ে সায় দিল।

চন্দর ফিরে এল পারঘাটায়। আসতে আসতে ভাবছিল কত বেশী মাটির মায়া থাকলে এমনি ধারা জোর করে কথা বলা যায়। মানুষের ওপর মায়া যাদের নেই মাটির ওপর মায়া তাদের জন্মায় না কোন দিন। এরা যেতে চায় না, আর হারানী পালিয়ে বাঁচে!

সন্ধ্যেবেলায় বাড়িতে ফিরে বারান্দায় চাটাই পেতে বসল। চিরকালকার সাথী একতারাটায় টুং-টাং আওয়াজ তুলল।

দক্ষ ঘাটে গিয়েছিল, ফিরে এসে চন্দরকে ও-অবস্থায় দেখে বলল, "আজ তোমার বিরহ গান শোনাও গোঁসাই।"

"তুমি যাওনি!"

অবাক হয়ে দক্ষ বলল, "তাড়াতে চাও বুঝি!"

"না, তা বলছিনা, ভাবছি আবার কেন মায়াতে জড়াও। নিজের পথ দেখাই কি ভাল নয় ?"

প্রদীপের সলতে কাঠি দিয়ে উস্কে দিয়ে দক্ষ চাটাইয়ের একধারে বসে বলল, "তাই দেখব তবে একা নয়, তোমাকেও সাথে নেব।"

চন্দর শুধু হাসল।

"হেস না গোঁসাই ; চল দুজনে বৃন্দাবনের পথে বেরিয়ে পড়ি। সেখানে দুমুঠো জুটেও যাবে, সংসারের ঝামেলাও রইবে না, তার সাথে প্রভুর চরণ দর্শনও হবে।"

চন্দর আবার হাসল।

"হাসির কথা নয় গোঁসাই। সংসারে বাস করলে ঝামেলার পর ঝামেলা। এই চাল আছে ত ডাল নেই, ডাল আছে ত নুন নেই, আজ পরিবারের শাড়ি চাই, কাল চাই নাকের নথ। বুঝলে ত চার পাঁচ মাস।"

জবাব না দিয়ে চন্দর একতারা তুলে নিল।

"আমার কথা ভাল লাগল না বুঝি ?"

নির্বিকার ভাবে চন্দর একতারা বাজিয়ে চলল, জবাব দেবার কোন লক্ষণই বোঝা গেল না। অন্ধকারে প্রদীপের আলো মাঝে মাঝে বাতাসের ধাক্কায় তার মুখে আলো-ছায়া এঁকে দিচ্ছিল।

চন্দরের মুখ থেকে বেরিয়ে এল, "হুঁ।"

চন্দর গান ধরল। দক্ষ বাধা দিয়ে বলল, "তুমি থাম গোঁসাই, আমি গাইব।"

দক্ষ গান ধরল, "বিপথে পড়িল যৈছে মালতী মালা।"

নিশুতি রাতের বুক বেয়ে দক্ষের কণ্ঠস্বর করুণ মুর্চ্ছনা নিয়ে ভেসে বেড়াতে লাগল। অবাক হয়ে শুনতে শুনতে চন্দর একতারা বন্ধ করে আবছা আলোতে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

"বেশ গলা তো তোমার !"

দক্ষ হাসল। হাসির ঝাপটায় চন্দর সঙ্কোচ বোধ করতে লাগল, বলল, "হাসির কথা নয়, তোমার গানে প্রাণ আছে।" অনুযোগের

সুরে কথাটা শেষ করে চন্দর আবার বলল, "তবুও তুমি হারানীর জাত।"

চন্দরের বাক্যবাণ দক্ষের মর্মভেদ করতে পারল না। শুধু দীর্ঘ-নিঃশ্বাসের একটা মৃদু শব্দ শোনা গেল।

দক্ষ উঠে দাঁড়িয়েছে ততক্ষণ। চন্দর জিজ্ঞেস করল, "চললে নাকি?"

"দেখি খাবার জোগাড় করি। হারানীর সংসার দেখতে থেকেই গেলুম যখন, তখন তোমায় না খাইয়ে রাখি কি করে?"

খাবার সময় দক্ষ জানাল যে চন্দরের বিছানা আজ ভেতরে করা হয়েছে আর দক্ষ রইবে বাইরের বারান্দায়। কিন্তু শোবার সময় দেখা গেল চন্দর বারান্দার চাটাই ছেড়ে ওঠেনি। দক্ষ খেয়ে এসে তাগাদা দিতে লাগল।

"ঘরে যাও গোঁসাই।"

"তুমি অতিথি নারায়ণ, তায় তুমি মেয়েছেলে, তোমায় বাইরে রেখে আমি ঘরে শুতে পারব না বাপু। তুমি ভেতরে যাও দক্ষ। কি যেন বলছিলে তুমি, বৃন্দাবন যাবার কথা।"

দক্ষ দাঁড়িয়ে ছিল, সে খুঁটিতে হেলান দিয়ে বলল, "সে কথা কালকে হবে। আমার ঘুম পেয়েছে গোঁসাই, তুমি আমার বিছানা ছাড়।"

এরপর বসে থাকা চলে না, তবুও চন্দর উঠতে চাইল না।

"উঠবে কিনা, নইলে আমি গিয়ে রান্না ঘরে শুয়ে থাকব।"

"না-না রাগ কর না, আমি যাচ্ছি।"

চন্দর উঠে ভেতরে গেল।

"দরজাটা খোলাই থাকল দক্ষ, দরকার হলে ডাকবে। অন্ধকারে বাইরে যাবার আগে সাড়া দিও।"

দক্ষ কোন জবাব না দিয়ে চাটাইয়ে গা এলিয়ে দিল।

দুজনের চোখেই ঘুম নেই অথচ কেউ কাউকে তা জানতে দিতে চায় না। দুজনেই চুপটিকরে শুয়ে রইল। শেষ প্রহরের মুর্গীর

ডাক কানে আসতেই দক্ষকে উঠতে হল। শেষ রাতেই নেয়ে ধুয়ে তুলসী তলায় গোবর দিয়ে ভোর না হতেই চন্দরের ফেনা-ভাত চড়াতে হবে। হারানীও তাই করত। চন্দর পারঘাটায় যাবে।

ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকে অন্ধকারেই টাঙান দড়ি থেকে শাড়ি গামছা টেনে নিল।

চন্দর গলা খ্যাঁকার দিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কে? দক্ষ, রাত থাকতেই যে উঠেছ।"

"তোমার মালসা ভোগের ব্যবস্থা করতে হবে তো?"

চন্দর পাশ ফিরে শুয়ে বলল, "ও কাজ তো তোমার নয়, ভাবনাও তোমার নয়। 'তাঁর ইচ্ছায়' মুখের অন্ন আপনা থেকেই জুটেছে, তোমাকে ভাবতে হবে না, শুয়ে পড় গিয়ে।"

"আমি তোমার কাজ করি এটা তুমি চাও না?"

চন্দর মুখ ফুটে বলতে পারল না, খুব চাই।

দক্ষ চন্দরের কোন উত্তর না পেয়ে শাড়ি গামছা দড়িতে রেখে নিঃশব্দেই চলে যাচ্ছিল। চন্দর ডাকল, "শোন দক্ষ।"

দক্ষ চৌকাটে দাঁড়িয়ে বলল, "বল।"

"আমার মালসা ভোগের ব্যবস্থা করতে কে বলল তোমায়?"

"তার কৈফিয়ত দিতে হবে কি?"

"তা নয়, তবে ভাবছি এ দরদ ক'দিনের।"

"গোঁসাই দেখছি পাকা জহুরী হয়ে গেছ। হীরেমোতির ব্যবসা করলেই ভাল করতে।"

"হীরেমোতি চিনতে পারিনি বলেই তো জিজ্ঞেস করছি।"

দক্ষ উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে কি যেন বলল বোঝা গেল না। হঠাৎ চন্দরের পায়ের কাছে বসে বলল, "অত কথার কাজ কি, চল গোঁসাই আমরা বেন্দাবনেই যাই। কাল সকালে তুমিও মুখ দেখাতে পারবে না, আমিও না, তার চেয়ে দুজনে বেরিয়ে পড়ি।"

"আমি তো কোন অপরাধ করিনি।"

"অপরাধ করনি! খালি বাড়িতে অন্যের পরিবার নিয়ে বাস করলে, লোকে তোমায় সাধু বলবে না কোনদিনই।"

"তা হলে!"

"যা বলছি তাই কর।"

সকাল না হতেই একতারা হাতে নিয়ে, পোঁটলায় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ভর্তি করে ঘাড়ে ঝুলিয়ে দক্ষের হাত ধরে চন্দর বেরিয়ে পড়ল।

চন্দর ঘাটে আসেনি। পারঘাটায় ভীড় জমেছে। ওপারে কলে ভোঁ বাজল তবুও চন্দরের দেখা নেই। খবর পেয়ে শওকত নিজেই গেল চন্দরের বাড়িতে। দরজা খোলা লোকজন কেউ নেই। আশে পাশের কেউ বলতে পারল না কোথায় সে গেছে। মাঝরাতে তাদের গান শুনেছে সবাই, সকালে উঠে কেউ তাদের দেখেনি।

শওকত ঘাটে এসে অনেকদিন পরে তার পরিচিত স্থানে পরিচিত ডিঙিতে বসল। সেই পাটনী শওকত, দুনিয়ার রং বদলে চলেছে, বদলায়নি বোধ হয় শওকত বেপারি।

এগারো

কদিন থেকে কানাঘুষা খবর আসছে এদেশে আর মুসলমানদের থাকা হবে না। শওকতের কাছে গাঁয়ের ভিন গাঁয়ের গরীব মুসলমানরা এসে বার বার জিজ্ঞেস করছে, তারা কি করবে? যাদের পয়সা ছিল তারা অনেক দিন আগেই পাড়ি জমিয়েছে, রয়ে গেছে যারা, তারা বলির পাঁঠার মত বাক্যহীন ভীতিতে বাস করছে।

সরকার-বাড়ির অঙিনায় এসে বড় কর্তাকে জিজ্ঞেস করল, "তা হলে কি করব কাকা?"

"তোরা যাবি না। যেতে চাইলেও তোদের যেতে দেব না। যদি কারুর হিম্মত থাকে আসে যেন সে লড়তে, মনি সরকার এখনও মরেনি, বুঝলি শওকত।"

শওকত ভয় পায়নি কোন দিনও, পাঁচ গাঁয়ের অসহায় লোকেরা তাকে ব্যস্ত করে তুলেছে তাই তাকে ছুটতে হয়।

আজকাল শওকত আর সকাল বেলায় আগের মত গা-ঝাড়া দিয়ে উঠতে পারে না। কেমন অবসাদ যেন তার সারা দেহে এলিয়ে রয়েছে। সাতসকালে পরী যখন পারঘাটায় যাবার তাগাদা দেয় তখন তার মনে হয় আরও কিছুক্ষণ গড়িয়ে নিতে পারলে সে যেন বাঁচত। চন্দর ক'মাস সাহায্য করেছিল, কিন্তু এখন বুড়ো বয়সে হাল ধরার শক্তি যেন তার দিন দিন উপে যাচ্ছে। অনেক দিনের ইজারাদারিটা যেন ছাড়তে পারলে সে বাঁচে। কিন্তু বড় মায়া। যশাইয়ের এই পারঘাটা কিছুতেই সে ছাড়তে পারেনি। হিন্দুস্থানে মুসলমানদের বেহাল হবে, আরও কত কি বলত দেশের লোক, তবুও সে ইজারা ছাড়েনি।

পদ্মার চর ভেঙে সেবার যখন সোঁতার মুখ বন্ধ হয়ে গেল তখনও সে ভয় পায়নি। জিজ্ঞেস করলে বলত, "পদ্মার চর ভাঙলে চর গজায়। পারঘাটা বন্ধ হলেও যশাইয়ের দোয়া তো বন্ধ হবে না।"

শহর থেকে কাম্মু এলে পরী অনুযোগ করে, "বাপের শরীরে দিকে একটু নজর দিস কাম্মু। সারা জীবন মেহনত করল, এখনও কি পারঘাটায় যেতে হবে তাকে?"

প্রথম প্রথম কাম্মু কথায় কান দিত না। শেষে বলল "বাপজান পারঘাটায় না গেলে বাঁচবে না মা। পয়সার খাঁকতি কতই বা আছে। খোদার ফজলে যা আছে, যা আনছি তাতে বাপজানের কাম করবার দরকারই হয় না। তিরিশ বছর ধরে যে অভ্যাস করেছে, ঘরে পয়সা থাকলেও সে অভ্যাস বাপজান ছাড়তে পারবে না। ঘরের চেয়ে ডিঙি তার বেশী পেয়ারের, বুঝলে মা।"

পরীজানও ভেবে দেখেছে এ বিনা কোনও উপায়ও নেই। শওকত বোঝালে বুঝবে কিন্তু সুর-সুর করে আবার গিয়ে বসবে ডিঙিতে। তাই আজকাল সকাল বেলায় শওকতের ঘুম না ভাঙলে পরী তাকে ডেকে দেয় না।

রবিবারে কল বন্ধ। পারানীর হাঙ্গামা কম। ক'দিন থেকেই ভাবছে নতুন দেখে একটা বড় ডিঙি বাঁধতে দেবে, পারানীর ভিড় হলে ক্ষেপ দিতে হয় বেশী, ছোট ডিঙিতে জায়গা হয় না।

সকালে ঘাটে আসতেও তার দেরী হয়েছে।

শওকত আসতেই বারোহাটের গদাধর বলল, "চাচা, আজ তোমার দেরী হয়ে গেছে।"

গদাধরের কথা শুনে শওকতের মুখে পরিতৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল, বলল, "আজ রবিবার, কল বন্ধ, বয়সটা তো বন্ধ থাকছে না গদাই।"

গদাধর ডিঙিতে উঠে বসল। শওকত বদরপীরকে সেলাম দিয়ে যশাইয়ের দিকে মুখ করে দোয়া মানল।

"শুনছ চাচা!" গদাধর একটু কাছে এসে বসল।

শওকত শুধু জিজ্ঞাসু মুখখানা তুলে ধরল।

"আমাদের বদনা তোমায় খুঁজছিল।"

"সরকারের চৌকিদারী তার বেয়া লাগল, সে গেছে কলের চাকায় জান দিতে।"

"জান দেবার সামিল হয়েছে। কলে কাজ নিয়েছিল, কলেই থাকে। বড়ই বেমার।"

"আছে কোথায়?" গম্ভীর ভাবে শওকত জিজ্ঞাসা করল।

"কলের বস্তিতে," বলেই অপর পারে ডাঙায় নেমে পড়ল গদাধর। হাটের পোঁটলাটা মাথায় তুলতে তুলতে বলল, "সে বলছিল তোমার কথা না শুনেই নাকি তার বেহাল হয়েছে। সে মাপ চেয়েছে চাচা।"

শওকতের গম্ভীর মুখে ক্ষীণ হাসির একটা রেখা বারেকের জন্য দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল। ডিঙিতে জোর ঠেলা দিয়ে ভাসিয়ে দিল।

বিকেল বেলায় ওপারে ডিঙি বেঁধে শওকত কলের দিকে রওনা হল। সারাটা রাস্তা সে বদনের কথা ভাবতে ভাবতে চলছিল। তাকে বদন ডেকে পাঠায় নি। ডেকে পাঠালে সে যেত না নিশ্চয়ই।

ডাকেনি বলেই বোধ হয় তাকে যেতে হচ্ছে। অনাদৃত হয়েই অনাগত সব সময় এসে থাকে। বদন ভুল বুঝতে পেরেছে, কিন্তু বড়ই দেরী হয়ে গেছে।

কলের বাবুদের বিরাট বাড়িগুলো পেরিয়ে নোংরা গলির দুপাশে টালির ছাউনি, মজুরদের বস্তি। অনেক কষ্টে বদনের আস্তানা আবিষ্কার করল। কিন্তু অন্ধকার খুপরির মধ্যে ঢুকতে কেমন যেন গা ছম্ ছম্ করতে লাগল। বাইরে থেকেই ডাকল, "বদন, ও বদন!"

শওকতের ডাকে জবাব এল না, ভেসে এল গোঁঙানির শব্দ। ঝাঁপ ঠেলে ঢুকতেই কেমন একটা ভ্যাপ্‌সা গন্ধে তার নাক বিষিয়ে গেল। অন্ধকারে কিছু দেখতে পাচ্ছিল না, আন্দাজে এগিয়ে আসতে আসতে বলল, "কোথায় রে?"

মাটি লেপা ছেঁচার দেওয়াল, মাথার কাছে ছোট্ট ঘুলঘুলি। ঘুল-ঘুলির আলোতে আন্দাজ করে নিল একটা বাঁশের মাচার ওপর কে যেন কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে রয়েছে।

"বদন! কেমন আছিস?"

"চাচা এসেছ! ও ভাবতেও পারি না!" অতি ক্ষীণ করুণ শব্দ। বলল, "তুমি এসেছ, বাঁচলুম!" একটা গভীর দীর্ঘশ্বাসের শব্দ আছড়ে পড়ল শওকতের কানে। কানের পর্দা দুটো বোধ হয় বিষিয়ে উঠল। বাঁচবার কোন সম্ভাবনাই এই অন্ধকার আলোবাতাসহীন গহ্বরে যে নেই তা শওকত ভালই বোঝে। কথা না বাড়িয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

"কেমন আছিস?" অনেকক্ষণ বাদে শওকত জিজ্ঞেস করল।

"ভাল না। বড়ই ব্যথা।"

ফোঁসফোঁসানি শব্দে শওকত চমকে উঠল, বলল, "সাপের মত ফোঁসাচ্ছিস কেন? বউ কোথায়?"

"বউ!" হতাশ ভাবে বলল, "সে চলে গেছে।"

"তোর অসুখ, বউ গেল কি করে? তার প্রাণে দয়ামায়া কি নাই? মানা করলি না কেন?"

বদন কোন জবাব দিল না। একটা চাপা কান্নার শব্দ শওকতের কানে এসে বাজল। সামলে নিয়ে বদন বলল, "বউ আর আসবে না চাচা। যখন গাঁয়ে ছিলুম তখন তার দয়ামায়া ছিল। কলের বস্তিতে মেয়েমানুষের দয়ামায়া থাকে না। শুকিয়ে শুকিয়ে আখের ছিবড়ে হয়ে যায়। তারই বা দোষ কি। মিস্ত্রীদের বউরা সেজেগুজে বের হয়, আর মজুরদের বউদের তা জোটে না। তার ওপর এই খারাপ বেরাম। কাজ কর্ম করতে পারি না, পয়সা নেই, ভালই করেছে, সে তো বেঁচেছে।"

নগদানগদ ভুলের মাশুল দিয়ে বদন বিকারহীন হয়ে গেছে।

"হ্যারিকেন আছে রে?"

"কুপি আছে। ম্যাচ্ বাকস বালিশের তলায়, কুপিটা জ্বেলে নাও চাচা।"

কুপির আলোতে সারা ঘরের চেহারা নগ্নভাবে শওকতের চোখের সামনে ভেসে উঠল। লম্বে প্রস্থে ছ' হাতের অন্ধকূপ, একপাশে উনুন আর কালিমাখা পোড়া হাঁড়ি-কড়াই, ওপাশটায় ভাঙা বাঁশের মাচায়ে নোংরা বিছানায় জীর্ণশীর্ণ বদন, পা থেকে গলা অবধি কাঁথায় ঢাকা। গাল ভেঙে গেছে, খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চোখ দুটো গর্তে ঢুকে গেছে।

"ভাড়া দিস তো?"

"দেই তিন টাকা। কোম্পানীর ঘর। কাজ না থাকলে ঘর ছাড়তে হবে। ভাড়াও দেইনি তিন চার মাস। খোট্টার মেজাজ, দারোয়ান নয় যেন লাটসাহেব। আমরাও সরকারের কাম করতুম, এত রোয়াব আমাদেরও ছিল না। কড়মড় করে কত যে গালি দেয়। মরাই ভাল চাচা।"

"বউ গেল কোথায়?" হঠাৎ প্রশ্ন করল শওকত। শওকতের গলার শব্দে বদনও চমকে উঠল। বলল, "খেতে দিতে পারতুম না তাই গেল। কোথায়? জাহান্নামের দক্ষিণ দুয়ারে। বয়স রয়েছে, চোখমুখ খুলেছে, সে কেন রইবে যক্ষ্মারুগী নিয়ে।"

"যক্ষ্মা! বলিস কি রে!"

"হাঁ চাচা। গলা দিয়ে রক্ত উঠল, ব্যস, কাজেও ছুটি হল। ভাবলুম গাঁয়ে ফিরে যাই। কারুর কথাই শুনিনি, শেষ অবধি জমি ক'বিঘেও বেচে দিলুম। গিয়েই বা কি হবে। তোমার কথাই ঠিক চাচা, ছিবড়ে পড়েছে আমার ভাগে। ভাগাড়ের শেয়ালরা রস খেয়ে শেষ করে দিয়েছে। ওপাশটার ইলু মিস্তিরী বদলিতে চলে গেল তুসরা কলে। যাবার বেলায় শেষ চুমুক দিল আমার বুকের রক্তে। সেও গেল, যাবার বেলায় আমার বউকেও নিয়ে গেল। অসুবিধে তো নেই। পরের বউয়ের মাথায় সিঁদুর থাকে, অতি সহজেই নিজের বউ বলে চালিয়ে নিতে পারবে। আর আমার তো ক্ষমতা নেই লড়াই করে বউ ফেরত আনি।"

হাঁপাতে হাঁপাতে বদন চুপ করে গেল। হঠাৎ বলে উঠল, "কলের ধর্মই ওরকম। ঘরসংসার করতে কেউ পারে না। ক'মাস আগে আলাবকশ পালাল মধুর বউকে নিয়ে। আর বাবুদের নজর, সেকথা না হয় ছেড়েই দিলুম। ভগবান ওদের ভাল করুক।"

বাধা দিয়ে শওকত বলল, "আর শুনতে চাই না, তুই গাঁয়ে ফিরে চল।"

"ও মুখো আর হব না চাচা। কালো মুখ দেখাতে পারব না। একটু জল দাও, তেষ্টায় গলা শুকিয়ে গেছে।"

জল খেয়ে আবার সে বলতে লাগল, "আর বাঁচব না চাচা। যাকে খুশী করতে সরকারী চাকরি ছেড়ে কলে এসেছিলুম, সেও চলে গেছে। এবার আমার ছুটি।"

জোর দিয়ে শওকত বলল, "তা হবে না বদন, গাঁয়ে তোকে যেতেই হবে। গাঁয়ের মাটিতে বড় হলি, গাঁয়ের মাটিতে জীবন কাটালি, মরতে হলে ঐ গাঁয়েই তোকে মরতে হবে, যশাইয়ের ঘাটেই তোর শেষ নিশ্বাস ফেলতে হবে। কালই গাড়ি পাঠাব, কোন আপত্তি না করে গাড়িতে উঠবি, বুঝলি!"

"অনেক কর্জ হয়েছে চাচা।"

"তাও শোধ দেব। আবার গিয়ে সরকারী চাকরি নিবি, শেষরাতে তোর হাঁক শুনি না অনেক দিন, সেই হাঁক শুনতে যেন পাই।"

শওকত ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল। ঘরের মধ্যে বসে মনে হয়েছিল অনেক রাত বুঝি হয়ে গেছে, বাইরে এসে দেখল এই সবে সাঁঝের পিদীম জ্বালাচ্ছে বস্তির রুগ্নমনা মানুষের দল।

পরের দিন সূর্য না উঠতেই ওসমানের গাড়ি চেয়ে নিয়ে মোকশেদের হাতে কটা টাকা দিয়ে বদনকে আনতে পাঠাল।

গরুকে জোয়াল ছাড়া করে ওসমান ঘরে ঢুকল।

ঝাঁপ খোলার শব্দে বদন মুখ তুলে দেখল। অন্ধকারেও বুঝল শওকতের প্রেরিত কেউ নিশ্চয় এসেছে।

বদন অতটা আশা করেনি। ওসমান আর মোকশেদের গলার শব্দে সে উঠে বসল। ওসমান দেরী করল না। দু' একটা মামুলি কথা বলেই বদনকে নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিল।

খড়ের গাদায় চট পেতে বদনকে শুইয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল।

বদন একটু মাথাটা উঁচু করে বলল, "তা হলে বাঁচব, তাই না মোকশেদ!"

মোকশেদ গাড়ির পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। বদনের কথায় উত্তর দিল, "আল্লার রহম।"

"তাই হবে, নইলে তোরাই বা কেন আসবি ভাই।"

ঘাট তো বেশী দূর নয়। ঘাটে গাড়ি আসতেই শওকত ছুটে এল।

বদন তখন ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে ছিল। শওকতকে দেখে শুধু আকাশের দিকে আঙুল উঁচিয়ে জানিয়ে দিল, আর সময় নেই।

"বদন!"

বদন কোন জবাব দিতে পারল না। গালের পাশ বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি ওসমান আর মোকশেদকে ডেকে বদনের গতায়ুপ্রায় দেহটাকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে এসে শুইয়ে দিল

যশাইয়ের ছায়ায়। বদন তখন হাঁফাচ্ছে। কি যেন বলতে চাইছে, বলতে পারছে না। অসাড় হাতখানা কোন রকমে নেড়ে ইশারায় জানাল তার শেষ ইচ্ছা। কি যে সে ইচ্ছা তা বোঝা গেল না। কস বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছে, তার মধ্যে একবার বহু কষ্টে অতি ক্ষীণ স্বরে বলল, "চাচা, জল।"

শওকত চীৎকার করে উঠল, "ওসমান পানি, জলদি পানি নিয়ে আয়।"

পানি আনতে আর হল না। যশাইয়ের ধুলোয় গা এলিয়ে দিল বদন চৌকিদার। তার পেটি পাগড়ির হিসাব নেবারও কেউ রইল না।

যশাইয়ের জামতলায় খড়ের বোঁদায় শুয়ে বদন বিশ্রাম পেল, শেষ বেলায় পানায় দিল শওকত, তার সারা জীবনের ঋণ শোধ হল।

অনেকক্ষণ মৃতদেহের দিকে চেয়ে থেকে শওকত বলল, "হিঁদুর ছেলে তার শেষ কাজ যেন হিঁদুর হাতেই হয়, বুঝলি ওসমান।"

বিকেল বেলায় চিতার আগুন নিবিয়ে যে যার ঘরে ফিরে গেল। শওকত একাই বসে রইল ডিঙির গলুইতে। মৃত্যুই সত্য, কিন্তু অপমৃত্যু, শওকত ভাবতে পারে না। হায়াত—মৌত মুরুব্বিদের কথা, তাদের কাছে শুনেছে রোজ-কিয়ামত অবধি বান্দারা ভিড় করে রইবে আল্লার হুকুম শুনতে। ইহজন্মেই আল্লার হুকুম মানতে মানতে তুনিয়া পয়মাল হয়ে গেল, পরজন্মে কি হবে কে জানে।

ছিলিম বদলে আবার শওকত এসে গলুইতে বসল।

ধীরে ধীরে যশাইয়ের ঝোপ আঁধারে মিশিয়ে গেল। শওকত যেমন বসে ছিল তেমনিই বসে রইল। মোকশেদ একবার ডাকতে এসেছিল, তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে, বলে পাঠিয়েছে, ঘাটে খাবার পাঠাতে।

ছইয়ের তলায় গুটিসুটি হয়ে শুয়ে শুয়ে বদনের কথা ভাবতে ভাবতে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

শেষ রাতে পারানির ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। রাত অনেক হয়েছে, এত রাতে পারানি সহজে আসে না। তবুও শওকতকে

উঠতে হল। ইজারদারের দিনরাত সমান, পারানি এলেই তাকে উঠতে হবে। শওকত উঠল।

ফিকে জ্যোৎস্নায় চেয়ে দেখল ঘোমটা টানা বউ, সাথে দু'জন জোয়ান মরদ। শেষ রাতে অনেক সময়ই এরকম পারানি আসে। এদের জীবনধারা সম্বন্ধে সে বেশ সচেতন। ঘর পালান মেয়েমানুষ তিরিশ বছর ধরে সে পরখ করছে। আগে আগে প্রশ্ন করত, সন্দেহ হলে আটকে রাখত। আজকাল গা সওয়া হয়ে গেছে।

আজ কেন বা তার মনে হল এদের এমনিভাবে দোজখের পথে নেমে যেতে দেবে না। জিজ্ঞেস করল, "কোথাকার গো তোমরা ?"

"পিরজিপাড়ার।"

"যাবে কোথায় ?"

"নাটুরা।"

"ওঃ! তবে ঘর ভাঙিয়েছ ?"

নাটুরার হাটে মেয়েমানুষ বিক্রি হয় একথা অনেক দিনই শুনেছে। শওকত কখনও নাটুরার হাটে যায় নি।

কেউ জবাব দিল না। মেয়েটা কেমন যেন জড়োসড় হয়ে পিছিয়ে পড়ল।

"কার ঘরের বউ ?"

জোয়ান মরদ দুটোর মুখও শুকিয়ে গেল।

"পয়সাওয়ালার ঘরে নিজের ঘরের মেয়ে বিক্রি করতে চলেছ। পেশাকর হবে, তাই না! ফিরছ কেন ? জবাব দাও। শওকত পাটনির নাম শোননি বুঝি ?"

শওকতের কথা শেষ হতেই সঙ্গী দুজন মাঠের আল ধরে দৌড় দিল। রইল শুধু ঘোমটা-টানা বউটা।

শওকত লাফিয়ে গিয়ে তার পথ আটকালো।

"দাঁড়াও ?"

মেয়েটার ঘোমটা খুলে গেছে। শওকত জ্যোৎস্নার ফিকে রোশনাইতে তার মুখের দিকে তাকাতেই মনে হল, তাকে যেন সে চেনে।

"তুমি হারানী না? চন্দরের পরিবার! কথা বলছ না কেন? শুনলাম তুমি নাকি মধু বোরেগীর আখড়ায় গিয়েছ। মন উঠছে না বুঝি, তাই নাটুরার হাটতলায় ঘর বাঁধতে চলেছ?"

ভয়ে হারানী কেঁদে ফেলল।

"কত জনের ঘরে আগুন দেবে তুমি? অন্তুকে মেরেছ, চন্দরকে ঘরছাড়া করেছ, মধুরও বোধ হয় শেষ হয়ে এসেছে। আর কেন, মতিগতি বদল করে ঘর বাঁধ কোথাও।"

হারানী কোন কথা বলে না, শুধু কাঁদে।

কাঁন্নার শব্দে শওকত একটু ঘাবড়ে গেল। বলল, "যাও, ফিরে যাও। যশাইয়ের মাটিতে পাপ সয় না, যাও, ফিরে যাও।"

ঘরভাঙানী হারানীর আজ ঘর খুঁজতে হবে এ কথা হারানী নিজেও বিশ্বাস করে না। অপরাধীর মত শওকতের সামনে দাঁড়িয়ে রইল।

"যাও, ফিরে যাও। দুনিয়াটা হারানী নয়, ভাল মানুষও আছে এখানে, তাদের খারাপ হবার পথ দেখিও না। সামলে চলতে শেখ।"

উত্তেজনায় শওকত কি বলতে কি বলে বসে! ফিরে এল তার ডিঙিতে। সাদা শাড়ি ধীরে ধীরে মাঠের আল বেয়ে ঝোপের ওপাশে অদৃশ্য হয়ে গেল। শওকত যেন হাঁফছেড়ে বাঁচল। শ্যামসুন্দরের কথা তার মনে পড়ল—'ওরা দায়ী নয় চাচা, ওদের ওপর রাগ করে লাভ নেই। ওরা চলবার মত শিক্ষা পায় নি, ওদের চলতে শেখান হয় নি। ওদের মনেই আনতে হবে পরিবর্তন, তবেই ওদের মুখ ফুটবে। ওরা নিজেদের পথ খুঁজে পাবে।'

বারো

কাঁকনমালা এসেছে। অনেক দিন পর আসতে হয়েছে, না এসে উপায় নেই। হারানকর্তা বদলি হয়ে এসেছে বাংলা মুলুকে। তাই তাকেও আসতে হয়েছে, ক'দিন থাকবে ঠিক নেই, নিজেও তো চাকরি করে।

খবর পেয়ে শওকত এসে হাজির হল। কাঁকনমালাকে দেখে শওকত খুশীতে ভেঙে পড়ল, বলল, "তা হলে তুমি এলে নতুন কাকি!"

কাঁকনমালা হাসল। শওকতের মনে হল সে কাঁকনমালা আর যেন নেই। চেহারা অনেক বদলে গেছে, আগে ছিল দোহারা চেহারা, এখন কেমন মুটিয়ে গেছে। যেমন হাসিটা তার মুখে লেগে থাকত তেমনটা আর নেই। বয়সও বেড়েছে সেই সাথে সাথে পরিবর্তনও এসেছে। মনের কথা না বলতে পারলেও, দেহের পরিবর্তন চোখেই দেখা যায়।

"এ দিককার খবর শুনেছ কাকি?"

কাঁকনমালা আর খবর নেবার তোয়াক্কা রাখে না, বলল, "কিসের খবর?"

"গ্রাম যে ফৌত হয়ে গেল।"

কি যেন ভেবে কাঁকনমালা বলল, "ও বেলায় এস পাটনী-ছেলে।"

শওকতের মুখে কে যেন কালি লেপে দিল। অনেক আশা করে সে এসেছিল। নতুন কাকি তাকে পথ দেখাবে, নতুন কাকি পাশে বসিয়ে বুড়ো ছেলের কথা শুনবে, গাঁয়ের সুখদুঃখ, হালচাল শুনবে, তা নয়, সে যেন কত বদলে গেছে। শওকত ধীরে ধীরে উঠে গেল। এমন মন মরা সে কখনও হয়নি। এর চেয়ে নতুন কাকির না আসাই ভাল ছিল।

বাড়িতে এসে পরীকে বলল, "নতুন কাকি এসেছে পরী।"

পরী গরজ না দেখিয়ে বলল, "ভাল কথা।"

"ভাল নয় রে, ভাল নয়। তার সাথে দেখা করতে গেলুম সে ভাল করে কথাই বলল না।" বলল, "বিকেলে এস।" কথাগুলো শেষ করে শওকত মুষড়ে পড়ল। পরী বুঝল শওকতের মনে আঘাত লেগেছে, এমন আঘাত তার প্রাপ্য নয়। ক'বছরই-বা হয়েছে, এই সেদিনও নতুন কাকির ডাকে শওকত আকাশ-জমিন এক করে বেড়াত। লোকের কাছে নতুন কাকির কথা বলতে সে পঞ্চমুখ হয়ে উঠত। সেই শওকতকে বিকেলে আসতে বলা আর ভাবাবেগে আঘাত দেওয়া একই কথা।

অভিমানাহত কণ্ঠে শওকত বলল, "জানিস পরী, দুনিয়াটাই বদলে গেছে। বদল হয়নি তোর আর আমার। আর যেন বদল না হয়।"

পরী কথার মোড় ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, "তোর পুত্তুর এসেছে।"

"হঠাৎ! আজ তো তার আসবার দিন নয়!" বলেই শওকত কেমন ভাবনায় পড়ে গেল। জিজ্ঞেস করল, "তোকে কিছু বলেছে কি?"

"বলছিল বা'জানকে ইজারদারি ছাড়তে বল।"

শওকত একথা অনেকবার শুনেছে, কথাটা কাম্মুর নয়, পরীর। বারবার কাম্মুর মুখ দিয়ে কথা বলিয়ে নেওয়া পরীর কথা। হেসে জিজ্ঞেস করল, "আর কিছু?"

"আর কিছু সে বলেনি, এবার আমি বলছি।"

"তুই তো বলেই আসছিস তিরিশ বছরের ওপর থেকে, বল আর কি তোর বলবার রয়েছে।"

"কাম্মুর বে দাও। ছেলের বয়স যে দেড় কুড়ি হয়ে গেল।"

একথা শওকতও অনেক দিন ভেবেছে, কিন্তু কাম্মু রাজি হয়নি বলেই বিয়ে আটকে আছে। শেতলবাড়ির নৈমুদ্দির মেয়ের সাথে কথা পাকাপাকি করেও বিয়ে হয়নি। নৈমুদ্দি নদীর ওপারে চলে গেছে। ক্ষেতখামারও বেচে দিয়ে গেছে। কাম্মুকে সে নিজে কখনও জিজ্ঞেসও করেনি, আজ পরীর কথায় তার মনে হল তার নিজের উচিত ছিল তাকে জিজ্ঞেস করা।

দুপুর বেলায় খেতে বসে শওকত বলল, "এবার সব বুঝে নাও বেটা। আমরা আর ক'দিন।"

কাম্মু মুখ না তুলেই জিজ্ঞেস করল, "বুঝবার মত কি আছে বা'জান।"

"জমি জমা, হাল গরু, ঘাটের ইজারা।"

"ও তো তোমার, আমার বুঝবার ওতে কিছু নেই। যা আমার তা আমি বুঝে নিয়েছি।"

"আমরা মরলে ওসব তো তোমারই থাকবে।"

"আইনে তাই বলে, কিন্তু যুগ্যি ছেলে বাপের দৌলত চায় কি? সে নিজে দৌলত পয়দা করে নেয়। তোমার ওসব তুমি দান করে হেবানামা করে যেও।

"মানে!"

"মানে আমার কিছুরই দরকার নেই। তোমাদের স্নেহ আর দোয়া এই নিয়েই জীবন কাটিয়ে যেতে পারব, ওসব ঝামেলা পোষাবে না। একা মানুষ, তার অত দরকার কি।"

"চিরকাল তো কেউ একা থাকে না।"

তরল ভাবে কথাগুলো আলোচনা করতে গিয়ে শওকতের শেষের কথায় কাম্মু সম্বিত ফিরে পেল। কি যে উত্তর দেবে ভেবে না পেয়ে চুপ করে রইল। সুযোগ বুঝে শওকত বলল, "এবার ঘর-সংসার কর, সব কিছু বুঝে নাও। আমার আর ক'দিন!"

"বা'জান!" অসহায়ের মত কাম্মু ডাকল।

"কোন আপত্তি শুনব না বেটা। দুনিয়াটা শুধু তোমার মা আর বাবা নিয়েই শেষ হয় না। আজকের ছেলে কালকের বাবা, পরশুর ঠাকুরদা, এই চলে আসছে বাবা আদমের জমানা থেকে। সেই কানুনের খেলাপ কখনও হয়নি।"

"বা'জান।" আবার কাম্মু অসহায়ের মত ডাকল।

"তোমার যা বলবার বল, বুড়ো বাপ-মা তোমার কথা না শুনে তো পারবে না, বল।"

"আমার এমন ক্ষমতা নেই যে তাদের প্রতিপালন করি।"

"তোমার বাবা শওকত বেপারি রাখালি করত সরকার-বাড়িতে, ছ' বেলায় পান্তা-গরম ভাত আর দেড় টাকা বেতন, এই ছিল প্রথম জীবনের সম্বল। শুধু মেহনত আর আল্লার নাম ভরসা করে ছুনিয়ার বুকে হামাগুড়ি দিতে লাগলুম। ধীরে ধীরে এতটা পথ এগিয়ে এসেছি, বুঝলে? ভয় পাবার মত কিছু নেই। আমার দৌলত তুমি না চাও ভাল কথা, নিজে দৌলত সৃষ্টি করে নাও। সেই দৌলতের ভরসায় ছুনিয়ার বুকে সুখের ঘর বাঁধ, তবেই তো বুঝব তুমি বড় হয়েছ, মানুষ হয়েছ। বিপদ আসবে ভেবে পালিয়ে বেড়ালে কোন লাভ হবে না, উপরি নিজের কর্তব্য নষ্ট হবে।"

কাম্মু ভেবেই পেল না তার বাবা এত কথা কি করে জানল। এত যুক্তি দিয়ে তাকে কথা বলতে কখনও সে শোনেনি। আশ্চর্য হয়ে শওকতের মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, "তোমার কথার উত্তর দিতে সময় লাগবে বা'জান।"

"বেশ, ছুদিন ভেবেই বল, কিন্তু জবাব দিও। জবাবের জবাব আমাকে খুঁজতে যেন না হয়।"

খাওয়া শেষ করে কাম্মু উঠে গিয়ে রান্না ঘরে পরীর কাছে গিয়ে বসল।

"তোর বা'জান কি বলল রে কাম্মু?"

"তোমার সেই পুরানো কথা। 'বিয়ে কর'।"

"তুই কি বললি?"

"বললাম, মাকে জিজ্ঞেস করে বলব। আচ্ছা মা, তোমাদের যে বিয়ে হয়েছিল সে বিয়েতে···না থাক।"

"বল না। আমাদের বিয়েতে কি হয়েছিল জানতে চাস?"

"না, থাক।" বলে কাম্মু বেরিয়ে পড়ল।

শওকতও ঘাটে এসে বসেছে। আজকাল সে খেয়া জমাতে দেরী করে ফেলে, ঠিক মনমত লোক না পেয়ে পারঘাটার কাজও কাউকে দিতে পারছে না।

ঘাটে এসে কাম্মু বলল, "আজ থেকে শহরে আর যাব না বা'জান। তোমার ডিঙির হেপাজত করব।"

শওকত তার কথা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসু ভাবে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

"বুড়ো বয়সে তুমি লাও ঠেলবে আর আমি টেরি কেটে বেড়াব এ তো হতে পারে না।"

"ওঃ! তাই বল, তুইও তো কামাই করিস। কামাই করতে কারুর টেরি কাটার দরকার হয় আবার কারুর নৌকার বৈঠা ধরবার দরকার হয়। তা বলে টেরি কাটার দল বৈঠা ধরে কামাই করতে চায় না, বৈঠা ধরার দল টেরি কেটেও বেড়ায় না। তা যদি হত, তা হলে দুনিয়ার চাকা অনেকদিন আগেই বন্ধ হয়ে যেত।"

কাম্মু বিষণ্ণ হয়েই ফিরে গেল। শওকত অন্যমনস্ক হয়ে কি যেন করতে চাইল। পেছন থেকে ডাক এল, "পাটনী-ছেলে।"

নতুন কাকিকে ঘাটে দেখে শওকত আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল। "তুমি কেন এলে কাকি, আমিই যেতুম।"

"সরকার-বাড়ির আঙিনায় সব কথা তো হয় না ছেলে, তাই তোমার তল্লাটে এলুম।"

নতুন কাকি ডিঙিতে উঠে বসল।

শওকতের অভিমান তখন অনেকটা কমে গেছে। কাঁকনমালা ডিঙিতে উঠে বসতেই সে বলল, "আর বাঁচান গেল না কাকি। যেদিন বিয়ে হয়ে এসেছিলে সেদিন থেকে যদি উঠে পড়ে লাগতে তা হলে এতগুলো গ্রাম ফৌত হত না। আজ বড়ই দেরী হয়ে গেছে। একটা প্রহরে কত ওলট পালট হয়ে যায়। এ তো কত বছরের কথা।"

"এসব রুখবার ক্ষমতা নেই পাটনী-ছেলে, এগুলোকে মেনে নিতেই হবে। লড়াই গেল, আকাল গেল, দেশ ভাগ হল, এরপরও যে মানুষ খেয়ে পরে বেঁচে আছে সেইটেই আশ্চর্য। মানুষ যে এখনও কুকুর হয়ে যায় নি তার জন্যই ভগবানকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মানুষের জীবনে দু' পাঁচ বছর তো কিছু নয় পাটনী-ছেলে।

হাজার হাজার বছর মানুষ লড়াই করে আসছে, তার ফল কতটুকু পেয়েছে ?"

শওকত চুপ করে শুনছিল। কাঁকনমালাও বোধ হয় আরও কিছু বলত, বাধা পড়ল ছিচরণ আসায়।

"পেন্নাম হই বউঠান," বলেই ছিচরণ শওকতকে উদ্দেশ করে বলল, "চাচা, কলে বড়ই গোলমাল।"

"গোলমাল! কেন রে ?"

"কেউ কাজ করছে না, বলছে ধর্মঘট, কাজ করব না। মাইনে বাড়াও, ঘর দাও বাড়ি দাও, আরও দাও—নইলে কাজ করব না।"

শওকত হেসে বলল, "চোরের ওপর রাগ করে মাটিতে ভাত খেয়ে কি হবে ? ওরা কল বন্ধ করে দেবে। তোদের জমিও গেছে, যা পাচ্ছিলি তাও পাবি না।"

কাঁকনমালাও হাসল, বলল, "অত সহজ নয় পাটনী-ছেলে। কল বন্ধ রাখতে ওরা পারে না। চৌদ্দ পয়সা সেরের চিনি চৌদ্দ আনায় বিক্রি করছে। এক টাকায় চার টাকা লাভ। লাভের আশায় ওরা দাদন দেয়, লাভ না করে ওরা ছাড়বে না। তবে বাইরে থেকে লোক আনিয়ে ওরা কাজ করাবে।"

শওকত কাঁকনমালার যুক্তি মনে মনে স্বীকার করল না, অথচ মুখ ফুটে কিছুই বলল না।

কাঁকনমালার কথাই ঠিক। কলওয়ালারা কল বন্ধ করল না, পুলিস মোতায়েন করে দিল কলের দরজায়, বাইরে থেকে মজুর আনতে আরম্ভ করল।

শওকত সবই শুনেছে। হঠাৎ সন্ধ্যে বেলায় শ্যামসুন্দর এসে সেলাম দিল।

"চিনতে পারেন চাচা ?"

ভাল করে নজর দিয়ে বলল, "হাঁ। কোথায় যাচ্ছ বাবা ?"

"আপনার কাছেই এলুম। কলের খবর শুনেছেন তো ?"

শওকত মাথা নাড়ল।

"মজুররা কাজ বন্ধ করেছে, মালিকরা ভাড়াটে লোক এনেছে, আজ তাই নিয়ে মারপিট হয়ে গেল।"

মারপিটের চোট যেন শওকতের বুকে লাগল, করুণকণ্ঠে বলল, "মারপিট না করলেই কি হত না? মিটিয়ে ফেললেই হত বাপ।"

"কে মেটাবে? চিনির দাম বেড়েছে চারগুণ, আর মজুরি বেড়েছে তেরো আনা থেকে পাঁচ সিকে। একি সহ্য হয়, তাও যদি জিনিসপত্তর মাগগী না হত তা হলে সহ্য হত। দিনরাতে বারো ঘন্টা কাজ করে মজুরি পাবে না, তা কি হয়?"

"তা তো বুঝলাম, কিন্তু এর পর তো পুলিসের হাঙ্গামা।"

"হাঙ্গামা! হাঁ, হাঙ্গামা না থাকলে জীবনের কোন দাম যে থাকে না চাচা। অশান্তির আগুন অশান্তি দিয়েই নেবান যায়। শান্তির বুকে যারা অশান্তিকে কায়েম রেখে পকেট ভারি করে তাদের সাথে হাঙ্গামা করলে ভবিষ্যতের মানুষ খেয়ে পরে বাঁচে।"

শওকত অতটা মেনে নিতে পারে না। তবে সে বুঝল তাদের শান্তির কেন্দ্র গ্রামের বুকেও কলের ধোঁয়ার সাথে সাথে অশান্তির ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়েছে। এর মীমাংসা আর হবে না। নতুন কাকি সত্যই বলেছে, একে মেনে নিতে হবে, এ বিনা আর পথ নেই।

শ্যামসুন্দর উঠে চলে গেলে শওকত ধীরে ধীরে সরকার-বাড়ির আঙিনায় এসে বসল।

কাঁকনমালা শওকতের আগমন সংবাদ পেয়ে উঠোনে এসে দাঁড়াল।

"শুনলে নতুন কাকি, কলে মারপিট হয়ে গেছে।"

"ঐটেই স্বাভাবিক। যারা ওদের কল গড়ে তুলল, যাদের বুকের রক্ত দিয়ে মালিকেরা টাকার পাহাড় রচনা করল তাদের বাদ দিয়ে বাইরে থেকে লোক আনলেই এরকম হয়ে থাকে। এটা শুধু এদেশেই নয় পৃথিবীর সব দেশেই হয়ে থাকে, ওর জন্য আপসোস করে লাভ নেই পাটনী-ছেলে। মনে আছে তোমার, সেই যে সবাইকে ডেকে

এনে বললুম, তোমরা জমি দিও না। ক'জন শুনল? সেদিন যদি মাটিতে পা দিতে না পারত তা হলে আজ আর এ হাঙ্গামা হত না। এখন এদের বাঁচাবার রাস্তা দেখ পাটনী-ছেলে।"

"তাই তো ভাবছি কাকি···" শওকতের কথা শেষ না হতেই বাইরে থেকে জসিম ডাকল, "চাচা!"

"ভেতরে আয় জসিম।"

জসিম ভেতরে আসতে জিজ্ঞেস করল, "কোথায় গিয়েছিলি?"

"ময়নাডাঙা। তোমার সেই ডাঙা জমি দেখতে গিয়ে দেখি দু'তিনশ জন লোক বাঁশ দিয়ে কয়েক গণ্ডা ছাপরা তুলছে। মানা করলুম, কে তোমাদের এখানে ঘর তুলতে বলেছে। তার উত্তরে যা বলল, "হায় আল্লাহ্, এদেশে আর থাকা যাবে না চাচা।"

"অত হতাশ হচ্ছিস কেন, কি হয়েছে বল না।"

"ওরা বলল, আমাদের ভিটে মাটি গেছে, এবার তোদের ভিটে মাটি যাক, তোরা তোদের দেশে যা।"

"আমাদের দেশ তো এইটে, বললি না কেন?"

"বললুম তো, ওরা বলল পাকিস্তানে যা।"

শওকত হেসে বলল, "এই তো আমাদের পাকিস্তান। যে দেশে মানুষ জন্মায়, বড় হয়, যে দেশের মাটিতে হামাগুড়ি দেয়, যে মাটি ধরে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়, যে দেশের মাটিতে বাপ-দাদা শেষ নিঃশ্বাস ফেলে সেই দেশই তার পাকিস্তান। এদেশ থেকে আমরা যাব না। ভয় পেয়েছিস জসিম, ভয় পাসনে। ওদের গিয়ে বল, তোমরা উদ্বাস্তু, তোমাদের বাস্তু আমরা গড়ে দেব। যার আছে সে দেবে বই কি!"

কাঁকনমালা শওকতের শেষের কথাগুলো ভাল করে লক্ষ্য করে বলল, "তাই বুঝি এদেশ কামড়ে পড়ে আছ?"

"এদেশ সেদেশ জানি না নতুন কাকি। যশাইয়ের মাটি ছেড়ে একপাও নড়ব না। যদি কোনদিন যেতে হয় সেদিন যাব আল্লার ডাকে, নইলে সেদিন যশাই আর থাকবে না। ওরা এসেছে হিংসুটে

জানোয়ারের কাছ থেকে তাড়না পেয়ে, তাই ওরা ক্ষেপে রয়েছে। ওরা যেদিন বুঝবে গরীবের পাকিস্তান তার মাটি, সে মাটির মাপও সাড়ে তিন হাত সেদিন ওরা ঐ হিংসুটে জানোয়ারদের টুকরো টুকরো করে কাবাব বানাতেও কসুর করবে না। সেদিনের বড় দেরী নেই। জাতের দোহাই দিয়ে দেশের জমি মাপা যায় না কাকি। যারা স্বার্থবাহী, যারা বেওকুফ তারাই জাতের গণ্ডী দিয়ে দেশের গণ্ডী ঠিক করতে চায়।"

কাঁকনমালা হাসল।

"হাসছ কাকি, আমার কথা বুঝি ঠাট্টা বলে মনে হচ্ছে?"

"না পাটনী-ছেলে। আগে ভাবতুম আমরা লেখাপড়া শিখে অনেক বড় হয়েছি, এখন দেখছি তা হই নি। তুমি এতদিন আমার কাছে জানতে এসেছ কি করলে এদের বাঁচান যায়, আজ ভাবছি, আমার চেয়ে তুমি বাঁচানর পথ বেশী জান। তোমার কাছেই আমার শিখবার সুযোগ রয়ে গেছে।"

শওকত লজ্জায় লাল হয়ে উঠল, বলল, "না কাকি তা নয়, বয়স বাড়লে অনেক দেখেশুনে মানুষ শেখে, সেই শিক্ষাটা পেয়েছি।"

"তাই তো বলছি পাটনী-ছেলে, পৃথিবীর কাছ থেকে যারা শেখে তাদের শিক্ষা বইয়ে পড়া শিক্ষার চেয়ে অনেক অনেক বেশী দামী।"

জসিমকে ডেকে শওকত বলল, "যা জসিম, ওদের বলে আয়। জবরদখল ওদের নিতে হবে না, আমি ওদের আপনা থেকেই জমি দেব।"

জসিম ইতস্ততঃ করে বলল, "আমি যেতে পারব না চাচা। ওখানে যদি আমায় খুন করে লাশ গুম করেও দেয় কারও বলবার নেই।"

"তোমাকে যেতে হবে না জসিম, আমি যাব," বলে কাঁকনমালা শওকতের দিকে চেয়ে বলল, "জমি তুমি দেবে দাও, কিন্তু মুসলমানের জমি বলে জবরদস্তি ওদের নিতে দেব না। শওকত বেপারি দেশ ভাগ করেনি, যারা ভাগ করেছে তাদের সাথে ওরা বোঝাপড়া করুক।"

শওকত বাধা দিয়ে বলল, "আল্লার মাল, ওদের ওপর রাগ করতে নেই কাকি।"

"তোমার আল্লা বুঝি জুলুমবাজি করতে বলেছে?"

"আল্লার কথা ক'জন শোনে কাকি? আল্লা তো আমাদের নয়, আল্লা তাদের যাদের পয়সা আছে, যারা জুলুম করতে পারে। আল্লা তাদের, আমাদের নয়। আমরা জন্মেছি শুধু আল্লার কথা শুনতে, সেই কাজটুকু আমরা করে চলব, ওরা জন্মেছে আল্লার নামে তুনিয়াকে ভোগ করতে; ওরা ওদের কাজ করে চলুক।"

"তোমার কথা মানতে পারছিনে পাটনী-ছেলে। আমি যাব, তুমি মানা করলেও আমি যাব। যারা অন্যায় করল তারা শাস্তি পাবে না, শাস্তি পাবে যারা অন্যায়কে ভয় করে, এ হতে দেব না। আমি-ই যাব।"

"যেতে তুমি পার কিন্তু লাভ হবে কি কিছু!"

কাঁকনমালা শওকতের কথার কোন জবাব না দিয়ে পরের দিন সকালেই ছিচরণ আর পটলা বাগ্দীকে সাথে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। ময়নাডাঙার দেড় মাইল পথ পেরিয়ে যখন সেখানে উপস্থিত হল তখন সেখানে যেন বাজার বসে গেছে। বাঁশ খড়ের গাদা পড়েছে।

অনেক কষ্টে তাদের মুরুব্বি তুচারজনকে খুঁজে বের করে কাঁকনমালা জিজ্ঞেস করল, "আপনারা এ জমিতে কিসের দাবিতে ঘর তুলেছেন?"

সামান্য প্রশ্ন। উত্তরটাও সহজ। কিন্তু কাঁকনমালার রণচণ্ডী মূর্তি দেখে বোধ হয় মুরুব্বিরা ঘাবড়ে গিয়েছিল। জমি দখল করবার অধিকার একমাত্র মুসলমানের জমি, এ যুক্তি যেমন অচল, তেমনি অচল ঐ ফুটো অধিকার।

কাকনমালার তীক্ষ্ণ অথচ সহানুভূতিপূর্ণ যুক্তির কাছে ওরা হার মানল।

তারা রাজি হয়ে গেল জমির বন্দোবস্ত নিতে। রণ-জয় করে কাঁকনমালা ফিরে এল। শওকতের কাছে সংবাদ পৌছাতে দেরী হল না, সেও এল, সব কথা মন দিয়ে শুনল।

"কিন্তু কাকি একদেশে চালে চাল দিয়ে বাস করতে হলে শান্তিতে থাকা যাবে কি?"

"শান্তি আসবে, তবে দেরীতে। অত চিন্তা কর না। শান্তি আপনা থেকে আসে না পাটনী-ছেলে, শান্তি আনতে হয়। তার জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়।"

শওকত কোনদিনই এ বিষয়ে চিন্তা করেনি, করবেও না। গাঁয়ের পর গাঁ ভেঙে সবাই যখন পালিয়ে গেল শওকত তার অনুচরদের নিয়ে নির্বিঘ্নে নিশ্চিন্তে বসে রইল। কত কথাই সে শুনেছে তাতে ভ্রূক্ষেপও করেনি।

সন্ধ্যে বেলায় আবার শ্যামসুন্দর এল। মুখ শুকনো, উস্‌কো-খুস্‌কো চুল। তাড়াতাড়ি তার খাবার ব্যবস্থা করে শওকত হেসে জিজ্ঞেস করল, "কল নিয়ে বড় ব্যস্ত, আসবার ফুরসত মেলে না বুঝি?"

"তা তো জানেনই। বলতে এলুম কাম্মুর কথা, তাকে পুলিসে ধরে নিয়ে গেছে।"

শওকত স্তম্ভিত হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করল, "তার অপরাধ?"

"মজুরদের কাজ করতে মানা করেছে।"

শওকত চমকে উঠল। শ্যামসুন্দরের কথাই তার কানে এসে বাজতে লাগল। কাঁকনমালার কথাই বুঝি সত্যি। শান্তিকে আনতে হয় ত্যাগ স্বীকার করে। বৃদ্ধের সবল মনের উপর কাম্মুর গ্রেপ্তারী সংবাদ যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল তাকে দমন করে বলে উঠল, "জামানত হয়নি?"

"তাই তো এলুম।"

শ্যামসুন্দরকে খেতে দিয়ে পরী চলে যাচ্ছিল। তাকে ডেকে বলল, "শুনেছিস তোর কাম্মুর কাণ্ড?"

কথাটা এমনভাবে বলল যেন কিছুই হয়নি। পরী ফিরে দাঁড়াল।

"তাকে পুলিস ধরে নিয়ে গেছে।"

পরী চীৎকার করে উঠল। হাত থেকে কাঁসার সানকি খন্ খন্ করে মাটিতে পড়ে গেল। কোনরকমে ঘরের খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে রইল।

"কাঁদছিস কেন পরী, আগে শুনে নে, তারপর কাঁদিস। কাম্মুর বাপ যাদের বাঁচাতে পারেনি, কাম্মু গিয়েছিল তাদের বাঁচাতে। ফল একই, একজনের বুকের মধ্যে পুড়ে যাচ্ছে, আরেকজন হাজতে বাস করছে।"

হো-হো করে শওকত হেসে উঠল।

শ্যামসুন্দর ডাকল, "চাচা।"

"না, কিছু হয়নি বাপ। শওকত বেপারির কলিজা অত নরম নয়। তবে ভয় পেয়েছিলুম সেদিন যেদিন ঐ কাম্মুই আল্লার দোহাই দিয়ে মানুষের বিরুদ্ধে মানুষকে উস্কানি দিচ্ছিল। আল্লার আসল হুকুম সে শুনতে পেয়েছে, আর কি ভয় পাবার আছে! মানুষের দুখদরদ যে আপন করে ভাবতে পারে সেই তো আল্লার আসল বান্দা।"

শওকতের মত মনের জোর পরীর নেই। সারা রাত সে কেঁদে কাটাল। জোরেও কাঁদতে পারছিল না যদি শওকতের ঘুম ভেঙে যায়।

বিহানের মুর্গী ডাকতেই শওকত বেরিয়ে পড়ল। সারারাত্রি জাগরণের পর পরী তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। তার মুখের দিকে কিছুক্ষণ অপলকে চেয়ে থেকে সে বেরিয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙাতে কেমন মায়া বোধ করল।

পরী ঘুম থেকে উঠে শওকতকে দেখতে না পেয়ে চিন্তিত হল। দু'বার সরকার-বাড়ি গিয়ে খবর করে এল। সেখানে কেউ বলতে পারল না শওকত কোথায় গেছে। পরী এ-পাড়া সে-পাড়ার ঘরে ঘরে খোঁজ নিয়ে বেড়াতে লাগল। সারাদিন জল মুখে দেবার সময় অবধি পায়নি। বিকেলের ছায়া নেমে আসতেই সে ফিরে এল।

ক্লান্তিতে আর দুর্ভাবনায় সে ভেঙে পড়ল। কোনরকমে টলতে টলতে উঠোনে পা দিয়েছে।

একি অবাক কাণ্ড! শওকত উনুন ধরিয়ে রান্না চড়িয়েছে, কাম্মু ধুচুনিতে চাল ধুচ্ছে।

শওকত জিজ্ঞেস করল, "কোথায় গিয়েছিলি তুই?"

"তোর পাত্তা করতে। সারাদিন না বলে কোথায় যাস?" পরী আঁচল তুলে মুখ ঢাকল।

"ছেলের পাত্তা বুঝি দরকার হয় না।" পুরানো শওকতের মন সামনে বয়স্ক লায়েক ছেলের কথাও ভুলিয়ে দেয়। সে তাড়াতাড়ি উঠে এসে পরীর মুখের ওপর থেকে আঁচল সরিয়ে দিল।

"ঘুমুচ্ছিলি তাই তোর ঘুম ভাঙাইনি, বুঝলি!"

তেরো

উদ্বাস্তুদের বাস্তুদান করে শওকত অনেকটা হালকা হয়েছে। কলের গোলমালও শেষ হয়েছে। মজুররা আংশিক দাবি মিটিয়ে নিয়ে কাজে যোগ দিয়েছে, কাম্মুও ছাড়া পেয়েছে। মোটামুটি শওকত নানা হাঙ্গামার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে।

কাঁকনমালা এতদিন গ্রামেই ছিল। তার যাবার দিনও এগিয়ে এল। শওকতকে ডেকে তার পরিকল্পনার কথা বুঝিয়ে দিয়ে সেও নিশ্চিন্ত মনে ফিরে গেল।

বড়ই একা একা মনে হতে থাকে শওকতের। বয়সের সাথে সাথে দেহ মন দুটোই ক্রমে ক্লান্ত হয়ে এসেছে; সে বিশ্রাম চায়। পারঘাটার ডিঙিকে ছেড়ে সে যে বাঁচতে পারে এমন কথা তার কখনই মনে হত না। সকালবেলা হলেই যশাইয়ের ঘাটে যাবার জন্য তার হাত পা নিসপিস করে, পরীর অনুযোগ অভিযোগের খাতিরে জসিমের ছেলে ওলির হাতে ডিঙি ছেড়ে দিয়ে সে অনেক বেলায় ঘাটে যায়। অনেক দূরে ভাটিতে ছিপ হাতে নিয়ে গাছতলায়

বসে সারাদিন কাটিয়ে দেয়। নিয়ম মত সরকার-বাড়ির আঙিনায় সন্ধ্যেবেলায় হাজিরা দিয়ে খোশগল্প করে বাড়ি ফেরে।

পরী আজকাল আর নড়তে পারে না। কোমরের ব্যথায় সেও মাঝে মাঝেই বিছানা নিতে বাধ্য হয়। পরী বিছানা নিলে শওকত কাজ পায়। রান্না, বাসনমাজা, পরীর সেবা করেই তার দিন কেটে যায়।

"আমি তো অকম্মা হয়ে গিয়েছি, তুইও হবি, তখন দেখবে কে ?"

পরীর সঙ্গত প্রশ্নের জবাব দেবার ভরসা পায় না। পরী মনে করে কাম্মুর বিয়ে দিয়ে এসব সমস্যার সহজ সমাধান করা যায়। কিন্তু তাতেও তো ভরসা নেই ; কাম্মু থাকে শহরে, সে তার বউ নিয়ে চলে যাবে নিশ্চয়ই, ফল হবে একই। তাদের এমনি ভাবেই থাকতে হবে। কাম্মু বিয়েতে নারাজ, তাকে জোর করে বিয়ে দেওয়া উচিত হবে কি ? আজ অবধি কাম্মুকে কোন কাজেই জোর করে ঠেলে সে দেয়নি। মানুষের যে খেদমত করে তার বিয়ে করবার অবসর থাকে কি !

পরীর অনুযোগের দেবার মত উত্তর থাকলেও দেওয়া হয় না। শওকত চুপ করেই থাকে। কবিরাজী মালিশ গরম করে তার কোমরে ডলতে ডলতে বলল, "আমি তো শক্ত-সমর্থ রয়েছি, তোর অত ভাবনা কেন ?"

"আর তোর যদি হয় !"

"সে তখন দেখা যাবে, তখন হয়তো তুই শক্ত-সমর্থ থাকবি।"

পরী বুঝল আসল কথার ধার দিয়েও শওকত হাঁটতে চায় না।

"শুনছিস পরী, আমাদের ময়নাডাঙার রিফুরা বলছিল, 'চাচা এবার তোমাকে পিসিডেন করে দিতে চাই'। পঞ্চায়েতের ভোট হবে, তাতে আমার নাম দেবে।"

"ও কম্মে তুই যাস না, কাম্মু জোয়ান মরদ সে ওসব করতে পারে। বুড়ো বয়সে হাঙ্গামায় জড়াসনি।"

"আমিও তাই বলেছি। তার ওপর মানুষের লোভ বেশি, কাল পিসিডেন হলে পরশু আরও কিছু হতে চাইব। গররাজি হয়ে ভালই করেছি, কি বলিস?"

"তুই কি আমার চেয়ে কম বুঝিস।"

"এক কাজ করলে কেমন হয় বলত? চল আমরা দুজন হজ করে আসি।"

"অত টাকা পাবি কোথায়?"

"তাই তো। একা একা ভাল লাগে না পরী। তোকে গাঁটে বেঁধে সংসার করতে বসেছিলাম, কত ঝড়-ঝাপটা বয়ে গেল, রয়ে গেল শুধু জীর্ণ দুটো দেহ।"

পরী কোন জবাব না দিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল।

"যাই রসুই শেষ করে আসি। আজ কাম্মুব আসার কথা।"

শওকত বেরিয়ে উঠোনে পা দিতেই মোহনের সাথে দেখা।

"তোমার তরে খাড়া হয়ে আছি চাচা।"

শওকত কিছু বলবার আগেই সে বলল, "জমিন জরীপ হচ্ছে চাচা। সরকার থেকে জমিন জরীপ হচ্ছে। সড়ক যাবে তেঘড়ির মাঠে।"

"ভালই তো। রাস্তাঘাটের অভাবে চলাচলের কষ্ট হচ্ছিল, সরকার যদি রাস্তা করেই দেয় তাতে আপত্তি কিসের।"

"জরীপের মাপে আমার ভিটে পড়েছে।"

"তোর ভিটে! বললি না কেন গাঁয়ের বাইরে দিয়ে রাস্তা হোক।"

"বলেছিলাম, তারা বলল সরকারী হুকুম।"

"সরকারী হুকুম, চল দেখি কোথায় জরীপ হচ্ছে।"

শওকত মোহনের সাথে বেরিয়ে পড়ল। আমিন তখন যশাইয়ের ঘাটে খুঁটো মেরে চেন টানছে।

শওকত জিজ্ঞেস করল, "কি হবে কত্তা?"

আমিন মুখ তুলে চাইবার অবসর পেল না। বলল, "রাস্তা।"

"কিন্তু এদিক দিয়ে রাস্তা হবে না।"

শওকতের গুরুগম্ভীর গলার শব্দে আমিন মুখ উঁচু করতে বাধ্য হল।

"রাস্তা তোমার ইচ্ছায় হবে না মিঞা, সরকারী হুকুম।"

"কিন্তু যশাইয়ের ঝোপের ওপর দিয়ে রাস্তা বসান চলবে না কর্তা, ওটা পীঠস্থান—দরগা।"

আমিনের ভ্রূটা একবার বেঁকে আবার সোজা হয়ে গেল।

"ও কথা সরকারকে বল মিঞা; আমার কাজ মাপের-চেন টানা, রাস্তায় মাটি ফেলা নয়।"

"তুমি মেপে গেলে সরকারকে রাজি করাতে অনেক সময় লাগবে, তার চেয়ে পয়লাই হাঙ্গামা মিটিয়ে ফেল কর্তা। যশাইয়ের ওপর দিয়ে কোন রাস্তাই যেতে পারে না। দু'শ বছরের পীঠস্থান—দরগা।"

"ওঃ! দেখি কি করতে পারি।"

আমিন কিছুই দেখল না, কিছুই করল না। বড় কর্তার মারফত খবর পেল রাস্তার নকশা হয়ে গেছে, যশাইয়ের গায়ের ওপর দিয়েই নতুন সড়ক ফেলা হবে।

শওকত গেল শহরে। বড় কর্তার সাথে শলা-পরামর্শ করে গ্রামে ফিরে এল। গ্রাম শুদ্ধ লোককে ডেকে হাজির করল তার নিজের বৈঠকখানায়।

"তা হলে কি হবে চাচা?"

"সবাই মিলে জেলার হাকিমের কাছে যেতে হবে।"

হাকিমের নাম শুনে অনেকেই ভয় পেল। থানার দারোগার কাছে যেতেই বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে, আর জেলার হাকিম!

"তা হলে তোরা যাবি তো?"

"তুমি গেলে আমরাও যাব।"

পরের দিন সকাল বেলায় শহরের পথে বেরিয়ে পড়ল দল বেঁধে। সরকার-বাড়ির বড় কর্তা তাদের অপেক্ষায় ছিল।

সারাদিন বসে থাকার পর বিকেল বেলায় হাকিমের সাথে দেখা হল। শওকত আর বড় কর্তা অনেক বুঝিয়ে বলল, অনেক যুক্তি দেখাল। কিন্তু হাকিম বুঝতে চায় না। তার এক কথা, ওখানে যখন কোন মন্দির বা মসজিদ নেই তখন ওখান দিয়ে রাস্তা যাবেই।

"ঐ গাছতলায় পুজো হয় বছর বছর। সিন্নি দেয় দশ গাঁয়ের লোক।"

"অমন গাছের অভাব আমাদের দেশে নাই। গাছতলায় পুজো করলে গাছ তো ভগবান হয় না।"

শওকত আর বড় কর্তা হয়রান হয়ে গেল। হয়রান না হলেও তাদের বিদায় করবার দায়িত্ব হাকিম নিজেই নিল। বলল, "এ নিয়ে মাথা ঘামাতে পারব না। সরকার রাস্তা ঘুরিয়ে নিতে পারেন না, ওতে কয়েক লাখ টাকা লোকসান। এ লোকসান কে দেবে? আপনাদের কথা উপরে লিখব কিন্তু কিছুই হবে না।"

বাইরে এসে বড় কর্তা বলল, "ভয় পাসনে শওকত, আমি তো রইলাম, দেখি কোন উপায় হয় কিনা। সরকারের কাজ হতে হতেও দু'বছর।"

"দু'বছর পরেও তো হবে।"

"অতদিন বেঁচেবর্তে থাকি তবে তো?"

সান্ত্বনা দিলেও শওকতের মন মানল না কিন্তু সে নিরুপায়, কিছু করবার মত ক্ষমতা তার নেই। মিলের ভোজপুরীর হাতভাঙা যত সহজ সরকারের নীতি ভেঙে দেওয়া তত সহজ নয় এ কথা শওকত বেশ ভালোভাবেই জানে।

তারই চোখের সামনে যশাইয়ের গাছ কেটে ফেলবে তা সে সহ্য করতে পারবে না, তার চেয়ে মরতে পারলে অনেক ভালো হত।

শ্যামসুন্দরকে ডেকে আনিয়ে তার বুদ্ধি পরামর্শ চাইল। সেও ছুটল শহরে। সেও চেষ্টা করল, কিছুই হল না।

যশাইয়ের গাছ বোধ হয় অলক্ষ্যে হেসেছিল, নইলে যার উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী তার কোন বিকার নাই কেন!

শওকত বাড়ি এসে অবধি ঝিমিয়ে পড়ল।

পরীর কোমরের ব্যথা কমেছে, সে আজকাল কাজ কর্ম করছে। শওকত গিয়ে ডহরের ধারে বুড়ো আমগাছ তলায় বসে। সারা দুপুর সেখানে কাটিয়ে সরকার-বাড়ির আঙিনা ঘুরে সন্ধ্যেবেলায় বাড়ি ফেরে। গাঁয়ের লোকজন যুক্তি-পরামর্শ নিতে আসলে চুপ করে বসে থাকে।

একদিন জসিম এসে বলল, "আমরা গাছ কাটতে দেব না। গাছের গায়ে কোপ দেবার আগে আমাদের গায়ে কোপ দিতে হবে।"

"তবুও গাছ রাখা যাবে না জসিম। এদেশে বিচার নাই। দু'শবছর ধরে মানুষ যাকে ভালবেসেছে সরকারী একটা কলমের খোঁচায় সে ভালবাসা নস্যাৎ হয়ে যাবে। ওদিক দিয়ে হাঁটিস না জসিম। ওরাও একদিন ভুল বুঝতে পারবে, সেদিন—"

শওকত আর বলতে পারে না, হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলে।

জসিম-ছিচরণের দল শওকতের যুক্তি মেনে নিতে রাজি নয়। তারা ঐ যশাইয়ের গায়ে কাউকে হাত দিতে দেবে না।

হলও তাই। ছমাসের মধ্যেই জনমজুরে মাঠ ভরে গেল। মাটি কাটা শুরু হল। সোঁতার বুকে লোহার সাঁকো বসল।

শওকতের ইজারদারিও খতম হল।

এবার যশাইয়ের পালা। সকাল বেলায় কুড়ুলের ঘা পড়তেই দশখানা গাঁয়ের শয়ে শয়ে লোক এসে বাধা দিল। জনমজুরের সংখ্যা সেদিন কম ছিল তারা ফিরে গেল সত্যি, তারপর এল পুলিস।

শওকত খবর পেয়ে ছুটে এল, আজ যদি গ্রামের লোকে বাধা দেয় তা হলে খুনোখুনি হয়ে যাবে। সে হাত জোড় করে ছুটে গেল দারোগার কাছে।

"একটু শুনুন হুজুর। ওরা যশাইকে ভালবাসে তাই যশাইকে কাটতে দিতে চায় না, একটা দিন সময় দিন হুজুর, আমি ওদের বুঝিয়ে আটক করব। নইলে খুনখারাবী হয়ে যাবে।"

শ্যামসুন্দর পেছনে ছিল সেও এসে অনুরোধ করল।

"কিন্তু আইন!"

"আইন! হুজুর আপনাদের আইনে ঘর ভাঙা যায়, ঘর গড়া যায় না, আপনাদের আইন শান্তির নামে অন্যের ঘরে অশান্তি আনে। যে আইন গড়তে পারে না, ভাঙতে পারে, সে আইন বে-আইন। আইন চাই না হুজুর। আইন তো মর্জি, মানুষ তো মর্জির গোলাম নয়। হুজুর আইন চাইনা, চাই শুধু একটা দিন সময়। কাল, কাল সকালেই—"

"কিন্তু আমার ওপর হুকুম রয়েছে।"

"আইনের হুকুম! হুজুর, আইনের হুকুম আসে কলের চাকা থেকে, মানুষের কলিজা থেকে নয়। আইন উচ্ছেদ করে, ঘর দেয় না। হতভাগার দেশে এই আইন। তবুও আল্লার আইন রয়েছে, তাকে মান্য করুন, একটা দিন সময় দিন।"

দারোগার বুকেও মায়ার প্রলেপ পড়ল। বলল, "বেশ, কালকেই কাটবে, কিন্তু আমরা পাহারা বসাব এখানে।"

"তাই করুন, কিন্তু একটা দিন সময় দিন।"

শওকত ফিরে গেল সবার মাঝে। বুঝিয়ে বলল এ প্রতিবাদের পরিণতি। অনেকে বুঝ'ল, অনেকে বুঝল না কিন্তু বন্দুকের সামনে তাদের কোন শক্তিই খাটবে না একথা তারা ভালই বুঝল। বিকেলের আগেই মাঠ খালি হয়ে গেল। শওকত ডাকল, "জসিম তিনখানা গাড়ি জোগাড় করে আনবি রাত বারোটা নাগাদ।"

"কেন চাচা?"

"তা নাইবা শুনলি।"

তেরোশ' উনষাট সালের এক আঁধার রাত।

তিনখানা গরুর গাড়ি এসে দাঁড়াল শওকতের দরজায়

শওকত অতি প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো দুখানা গাড়িতে বোঝাই দিতে দিতে কেঁদে ফেলল।

"জসিম।"

"জসিম বাড়ি গেছে চাচা, আমি ছিচরণ রয়েছি।"

"তোর সাথে কে রয়েছে ?"

"আমার পরিবার।"

"তোর পরিবার! কেন ?"

"যশাইয়ের মাটিতে আর বাস করব না চাচা। তোমার সাথেই চলে যাব।"

"কোথায় যাবি ?"

"যেখানে তুমি যাবে সেখানে। জসিমও আসছে তার মালপত্তর নিয়ে, বিবি-বাচ্ছা নিয়ে।"

শওকত চিন্তিত হল, বলল, "তা হলে সারা গাঁয়ে খবর রটিয়ে দিয়েছিস।"

জসিম এসে গেছে, সেও গরুর গাড়ি বোঝাই দিয়ে মালপত্তর নিয়ে এসেছে।

শুকতারা উঠেছে আকাশে।

পরীজান এসে উঠল গরুর গাড়িতে, সেই গাড়িতে উঠে বসল ছিচরণ আর পটলার পরিবার।

"তা হলে গাড়ি ছেড়ে দে জসিম। রাত তো শেষ হয়ে এল।"

"তুমি গাড়িতে ওঠ চাচা।"

"না আমি হেঁটেই যাব।"

"কিন্তু গাড়ি যাবে কোথায় ? পাকিস্তানে ?"

"পাকিস্তানে!" আশ্চর্য হয় শওকত। "আমরা দেশ ছেড়ে কোথাও যেতে পারব না জসিম। ওপারে পদ্মার চরে পাকিস্তান, এপারে ভাগীরথীর চরে সুতী, সুতীর মোহানায় গিয়ে নতুন করে ঘর বাঁধব, ভুলে যাব বাপ-দাদার যশাইকে। যশাইয়ের মাটি ছাড়তে হবে

কোনদিন তা তো জানতুম না, যখন ছাড়তেই হল তখন এ এলাকায় আর থাকব না।”

মাল বোঝাই গাড়িগুলো চলতে শুরু করেছে। পরীদের গাড়িতে সবে পর্দা জুড়ে দেওয়া হয়েছে এমন সময় এসে দাঁড়াল বড় কর্তা মনি সরকার, সঙ্গে বড় কর্ত্রী।

“পাগল হলি নাকি শওকত ?” জিজ্ঞেস করল বড় কর্তা।

“হইনি, আর একদিনও এখানে থাকলে নিশ্চয়ই পাগল হতে হবে।”

“কিন্তু তোর যাওয়া হবে না।” জোর দিয়ে বড় কর্তা বলল।

“না কাকা, যেতে আমাকে হবেই হবে, যে দেশে ইনসাফ নেই বিচার নেই সে দেশে বাস করা আর সাপের লেজে পা দেওয়া একই কথা। এ দেশে থাকব না, থাকব না।”

শওকত ফুঁপিয়ে উঠল।

“যশাইয়ের ঘাটে ষাটটা বছর কেটে গেল। হিন্দু-মুসলমানের পীঠ যশাইকে অসম্মান কেউ কোনদিন করেনি, কিন্তু আজ তাই হল! এই তো হল আমাদের স্বাধীন দেশ! সে অবমাননা সহ্য করব না কাকা। থাকব না এদেশের এই অবিচারের মধ্যে।”

“তা হলে তুই আমাদের পর মনে করলি ?”

“তোমরা তো পর নও, পর যারা তারাই আমাদের ভিটে ছাড়া করল। তা হলে আসি কাকা, ভেবেছিলুম চুপি চুপি চলে যাব, তা আর হল না। ভালই হল, সরকার-বাড়ির নিমক খেয়েছি সাতপুরুষ ধরে, দেখা করে না গেলে গুনাহ হত। তা থেকে বাঁচলুম। নে জসিম তোর চাচির গাড়ি ছেড়ে দে।”

“তা হলে সত্যিই যাবি ?”

“হাঁ কাকা, আমাদের সাজান ঘরে ঘুণ যখন ধরেছে তখন আর সে ঘর মেরামত করব না, আবার নতুন করে সম্বন্ধ পাতিয়ে ঘর বাঁধব। রইল আমার জমিজমা, সেগুলো তোমাদের হেফাজতেই থাকল।”

বড় কর্ত্রী শুধু ‘শও-বেটা’ বলেই কেঁদে ফেলল।

বড় কর্তা পাথরের মত নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

একে একে গাড়িগুলো অন্ধকারে মিশে গেল। শওকত জসিমের হাত ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল গাড়ির পেছন পেছন।

যশাই তলায় আসতে আসতেই আকাশ অনেকটা পরিষ্কার হয়ে এসেছে। পূর্বদিককার আকাশে লালিমার রেখা দেখা গেল। ষাট বছরে এমন সকাল বোধ হয় কখনও হয়নি, শওকত তাই চোখ কচলে ধলাটগাঁয়ের শেষ সকাল দেখে নিল। এমন সকাল সে আর দেখতে পাবে না। চারখানা গরুর গাড়ি চলেছে আগে আগে, পেছনে পায়ে হেঁটে চলেছে শওকত, জসিম, পটলা আর ছিচরণ।

যশাইতলায় এসে শওকত হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল। জসিম কোন রকমে শওকতের হাত ধরে এগিয়ে চলছিল।

শওকত ফিরে দাঁড়াল। মৌন ব্যথার কোন অভিব্যক্তি নেই, শুধু জসিমকে বলল, "আজ বেলা আটটায়"—বলেই হাত তুলে সেলাম করল।

দু'শ বছরের কত স্মৃতিমাখা যশাইয়ের অপমৃত্যু দেখবার জন্য শওকত অপেক্ষা করতে পারবে না, থাকুক পেছনে পড়ে হাজারো স্মৃতি, সব কিছু মন থেকে টেনে ফেলে দিয়ে নিঃশব্দে শওকত সবার সাথে এগিয়ে চলল। জীবনের কালো কেতাবের একখানা পৃষ্ঠা সবার অলক্ষ্যে ফেরেস্তা বোধ হয় উল্টে দিল।

সতী যশোমতী তলাপাত্তরদের ছোট বউ, হাসমত চৌধুরীর বিবি নূরী বেগম, বাংলার নবাব নাজিম—সব অধ্যায়ের শেষ অধ্যায় যশাইয়ের গায়ে কুঠারের কঠিন আঘাত।

কেউ কি কঁকিয়ে কেঁদে উঠেছিল, কোন শিশু কি আঁতকে উঠে মাকে জড়িয়ে ধরেছিল, কে জানে!

সুতীর চরায় নতুন উপনিবেশ গড়ে তুলেছে শওকত।

আজও মাঝরাতে পরীকে ডেকে তোলে, "পরী শোন, শুনছিস ঐ

মড়মড়িয়ে যশাইয়ের গাছ ভেঙে পড়ছে, বর্গীর লাঠির খোঁচায় হাসমত চৌধুরীর লাশ গড়িয়ে পড়ছে। শুনছিস পরী ?”

পরী আলগোছে শওকতের মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।